১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৫ আশ্বিন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২৩ জিলক্বদ, ১৪৩৪ হিজরি | ৩০ তাবুক, ১৩৯২ হি. শা. | ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ঈসাব্দ

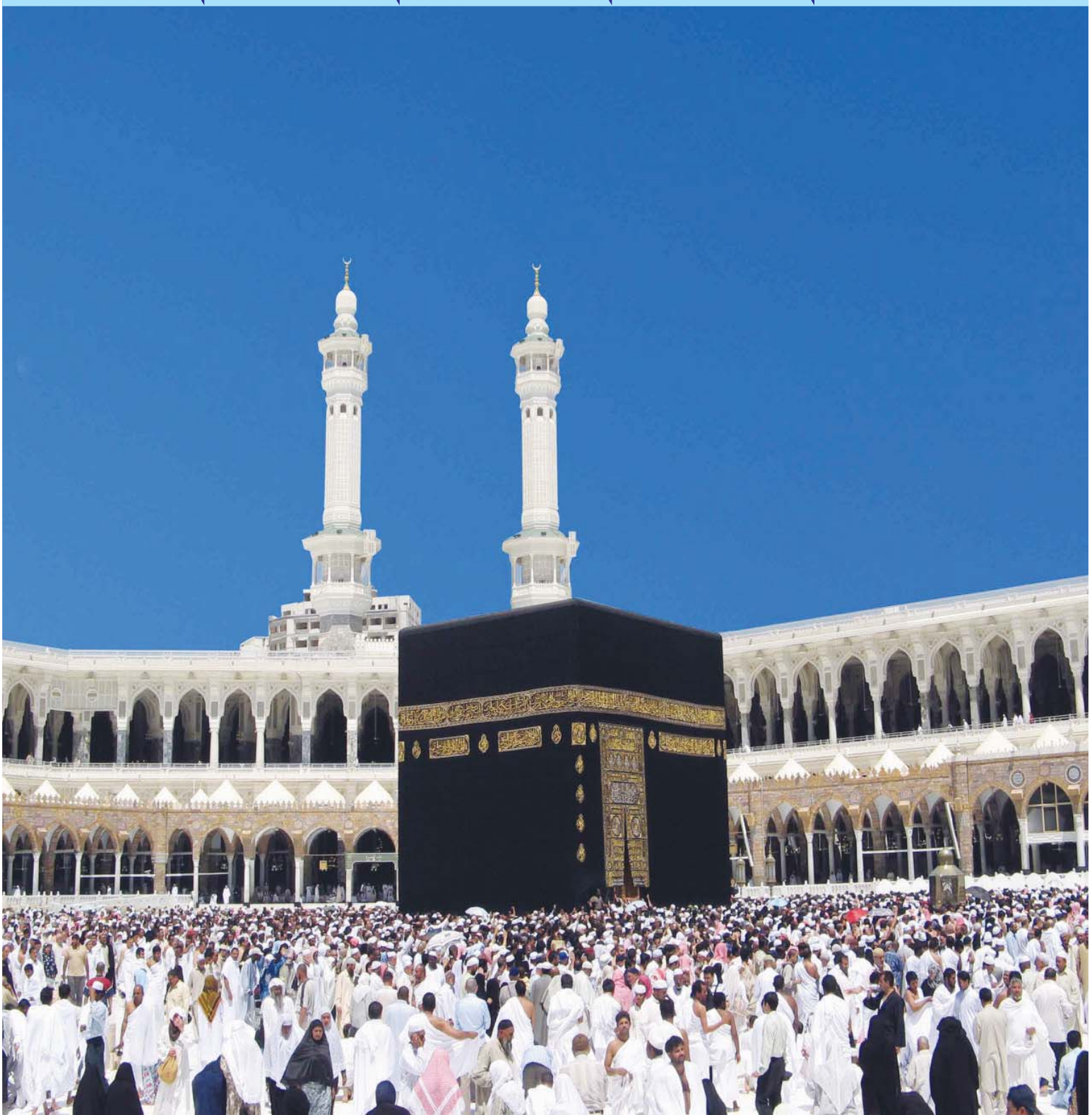

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

সিরিয়া সংকটঃ উত্তপ্ত বিশ্ব পরিস্থিতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ও উত্তরণের উপায়

সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। এমনটি ঘটলে সিরিয়ার এই সংঘাত এতটা ছড়িয়ে পড়বে যে পরিণামে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। সিরিয়ার সংঘাতময় এই পরিস্থিতি ইতমধ্যে বিভক্তি ও বিভেদ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে কতিপয় বৃহৎশক্তি সিরিয়ার বর্তমান সরকারের পক্ষ নিয়েছে আবার অন্যান্য কয়েকটি বৃহৎশক্তিধর রাষ্ট্র সিরিয়ার বিদ্রোহীদেরকে সহযোগিতা দিয়ে চলছে। এতে বিশ্ব মারাত্মক এক হুমকির মুখে পতিত হয়েছে।

বিদেশি বৃহৎশক্তি সিরিয়ার এই সংঘাতে সরাসরি জড়িয়ে পড়লে তা কেবল আরব দেশগুলোর জন্যই মারাত্মক হবে না বরং অন্যান্য দেশগুলোও হুমকির মুখে পড়বে। মনে হচ্ছে বৃহৎশক্তির অধিকারী অনেক দেশই অবস্থাটি বুঝতে পারছে না। কেননা এমন একটি যুদ্ধ সংঘটিত হলে তা শুধুমাত্র সিরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এ থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুত্রপাত ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে।

এটি দুঃখজনক যে সিরিয়ার এই সংকটের উদ্ভব ঘটেছে মুসলমানদেরই মধ্যে, যারা একই কলেমার অনুসারী-র দাবীদার। সিরিয়ার সমগ্র জাতীসত্ত্বাকে অস্থিতিশিলতা ও সংঘাতের মুখে এই সংকট এমনভাবে ঠেলে দিয়েছে যে কোন পক্ষই আজ আর নিরাপদ নয়। সিরিয়ার ভেতরের ও বাহিরের সন্ত্রাসী ও চরমপন্থি দলগুলো বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করে পরিস্থিতি আরো ভয়ানক করে তুলেছে। এই সব চরমপন্থি ও সন্ত্রাসীদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের পরিণতি দীর্ঘদিন সিরিয়াকে বয়ে বেড়াতে হবে।

আরো কিছু মুসলিম দেশে যেসব অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে তার কারন হলো সেইসব দেশের সরকার ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

পবিত্র কুরআন মুসলিম উম্মাহকে মানবজাতির কল্যাণ সাধনকারী বলে আখ্যায়িত করেছে অথচ মুসলিম নেতারা আজকাল বিশ্বের কোন মঙ্গলটা সাধন করছে? না আছে তাদের মাঝে মানবপ্রেম ও সহনশীলতা আর না তারা পালন করছে ইসলামের সৌন্দর্যপূর্ণ কোন অনুশাসন। তারা আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে নিজ ভাইদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্য বাহিরের সাহায্য নিচ্ছে।

অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রতিবেশীদের উচিত উদ্যেগী হয়ে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ একটি সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে জাতিগত শত্রুতা ও বিরোধের কারনে কোন প্রকারের অন্যায় ঘটতে দেয়া যায় না, শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ সহাবস্থানের মর্যাদা সর্বদা ব্যক্তি বা জাতীয় স্বার্থের বহু উর্ধ্বে থাকবে।

অতএব সিরিয়া সংকট সমাধানে মুসলিম বিশ্বের সর্বাগ্রে উদ্যোগ নেয়া উচিত। মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন (OIC) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে বহু আগেই পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। কেননা এরা সবাই এক খোদা, একই রসূল (স.) আর একই পবিত্র কুরআনের অনুসারী। মুসলিম দেশগুলো পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা আলোকে শান্তি স্থাপনে যথাযথ উদ্যোগ নিবে, এটাই কাঙ্খিত।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বিশ্ব নেতৃবর্গ এবং রাজনীতিবিদদেরকে এই ক্রান্তিকালে ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত তার সীমিত শক্তি ও সামর্থ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ এই বার্তাটি বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করে চলছে। তিনি (আই.) ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে বিগলিত দোয়ার সাথে সাথে নিজেদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি (আই.) আহমদী মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেন, বিশ্বব্যাপি আহমদী মুসলমানরা বিশ্ব-শান্তি সুরক্ষায় এবং সকল প্রকার দুর্যোগ ও ধ্বংস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা দোয়ায় নিয়োজিত থাকবেন। অবশ্যই আমরা দোয়ায় রত থাকবো কেননা আমাদের প্রভু ও নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল মানুষের মাঝে প্রেমপ্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতি এবং স্রষ্টার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে সমগ্র বিশ্বে শান্তি ছড়িয়ে দিতে আবির্ভুত হয়েছেন।

তিনি (আই.) আরো বলেন, মুসলিম দেশের সরকারগুলোর আত্মসম্মান জাগ্রত করা উচিত, কেবল নিজেদের গোষ্ঠি স্বার্থ না দেখে মুসলিম বিশ্বের কল্যাণ এভং স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, এটা কেবল তখনই সম্ভব সরকারী কর্মকর্তাগণ এবং দেশের নাগরিকগণ প্রকৃতই যখন খোদাভীতি নিয়ে মহানবী (স.)-এর আদর্শের অনুসরনে সর্বান্তকরনে নিয়োজিত হবে।

আল্লাহ্ করুন, সংশ্লিষ্ট সকলে যুগ ইমাম নির্দেশিত এই পন্থায় পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্বকে এক শান্তির নীড়ে পরিণত করার প্রয়াসে উদ্যোগী হবেন।

সূচিপত্র

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত **ঈদুল আযহার খুতবা** (২৭ অক্টোবর ২০১২)	৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (১২ জুলাই ২০১৩)	১৩
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২৬ মে, ২০১৩)	১৯
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২০ মে, ২০১৩)	২১
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (৩১ আগষ্ট, ২০১৩)	২৩
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (৩০ আগষ্ট, ২০১৩)	২৫
রূপক-বর্ণনার অন্তরালে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৭
বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস খন্দকার আজমল হক	৩০
প্রেমময় হজ্বের সন্ধানে মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২
পাঠক কলাম- ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, আনোয়ারা বেগম, আহমদ উজ্জল, লাকি আহমদ, শায়লা আক্তার শান্তি, শেখ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্	৩৪
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-	৩৯
সংবাদ	৪০
আপনার সন্ধানে আছি!	৪৩
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪৪

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামা'তের যে সকল সদস্য 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক কিন্তু তাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদের বকেয়া চাঁদা সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চাঁদা আদায়ের রশিদের ফটোকপি সেক্রেটারী ইশায়াত এর বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় ইশায়াত দপ্তরের হিসাব সংরক্ষণের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে, জামা'তের যাবতীয় পুস্তক জামা'তের রশিদের মাধ্যমে বিক্রয় করতে হবে। রশিদ ছাড়া কোন বই বিক্রয় করা যাবে না।

এছাড়া যারা পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক নন তারা মাত্র ২৫০/- টাকায় পুরো এক বছরের গ্রাহক হতে পারেন আর বহির্দেশে গ্রাহকদের জন্য ১০০ ডলার। আর যদি প্রতি কপি ক্রয় করতে চান তাহলে তার মূল্য ২০/- টাকা।

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
যোগাযোগ : ০১৯১৮-৩০০১৫৬, ০১৬৮৬২৬৪৫৯৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿۳۶﴾

৩৬। আর (স্মরণ কর) ইবরাহীম যখন বলেছিল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক। এ শহরকে তুমি শান্তিধাম বানিয়ে দিও এবং প্রতিমা[১৪৬৮] পূজা থেকে আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করো।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۷﴾

৩৭। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় এগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমারই। আর যে আমার অবাধ্যতা করে (তুমি তাকেও ক্ষমা করো, কারণ) তুমি যে বড়ই ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের [১৪৬৯] কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! (আমার এমনটি করার কারণ হলো) তারা যেন নামায[১৪৭০] কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মন তাদের[১৪৭১] দিকে আকৃষ্ট করো এবং তাদেরকে ফলফলাদির রিয্ক দান করো যেন তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

১৪৬৮। এই আয়াতে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া এটাই ব্যক্ত করছে যে, তিনি জানতে পেরেছিলেন, এক সময় মক্কা এবং এর চতুস্পার্শ্বের দেশগুলোতে মূর্তিপূজা বিরাজ করবে। অতএব তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে মূর্তিপূজার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য শত শত বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করেছিলেন।

১৪৬৯। এই আয়াত হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইসমাঈল ও তাঁর স্ত্রী হাজেরাকে আরবের মরুভূমিতে বসবাস করা সম্পর্কিত। ইসমাঈল তখনো শিশু যখন ইব্রাহীম (আ.) ঐশী আদেশের আনুগত্যে এবং ঐশী পরিকল্পনার পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে তাঁকে ও তাঁর মাতা হযরত হাজেরাকে যে অনুর্বর জনশুন্য অঞ্চলে বসবাসের জন্য এনেছিলেন, সেখানে আজ বিরাট মক্কা নগরী দন্ডায়মান। সেই সময়ে সেই স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন এবং জীবন ধারনের কোন উপায় উপকরণ ছিল না (বুখারী)। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা এমন যে, সেই মরু অঞ্চল আজ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার শেষ বাণীর কর্মকান্ডের অপূর্ব প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেই ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমরূপে মনোনীত হয়েছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)।

১৪৭০। আয়াতে উল্লেখিত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কেবল আরবের অধিবাসীরাই তাদের পূজার নৈবেদ্য অর্পণ করতে মক্কা আসতো। কিন্তু তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পরে বিশ্বের সকল স্থান থেকে দলে দলে লোক মক্কায় যিয়ারতে আসতে শুরু করেছে।

১৪৭১। এই প্রার্থনা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এমন এক সময়ে করেছিলেন যখন মক্কার চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলব্যাপী একটি তৃণও নজরে পড়তো না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হয়েছে। কারণ সব মৌসুমেই উৎকৃষ্ট ফলসমূহ প্রচুর পরিমাণে মক্কায় আসে।

হাদীস শরীফ

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত।

তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস।

কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়।

খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আরো একটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ। যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে।

আল্লাহ্ হজ্জের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য-রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' শীর্ষক নিবন্ধ হতে গৃহীত)।

"কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয়-প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের-প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে।

প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী-আইনে হজ্জের প্রকৃত-অর্থ এটাই" ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত-তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক-কর্ম আধ্যাত্মিক-হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদের হাজী বলুক, এ-জন্যই অসৎ-উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহীত হয় না, কেননা, তা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক-বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগের মাস' বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমনভাবে তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত-সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের-আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র" (মলফুযাত, ২য় খন্ড)

ঈদুল আযহার খুতবা

চার হাজার বছর পূর্বের কুরবানীর শিক্ষা ঈদের দিনে শুধু একটি ছাগল কুরবানী করার মাধ্যমে গ্রহণ করবেন না বরং সেই কুরবানীকে আজও সর্ব ক্ষেত্রে প্রবহমান রাখায় সচেষ্ট হউন।

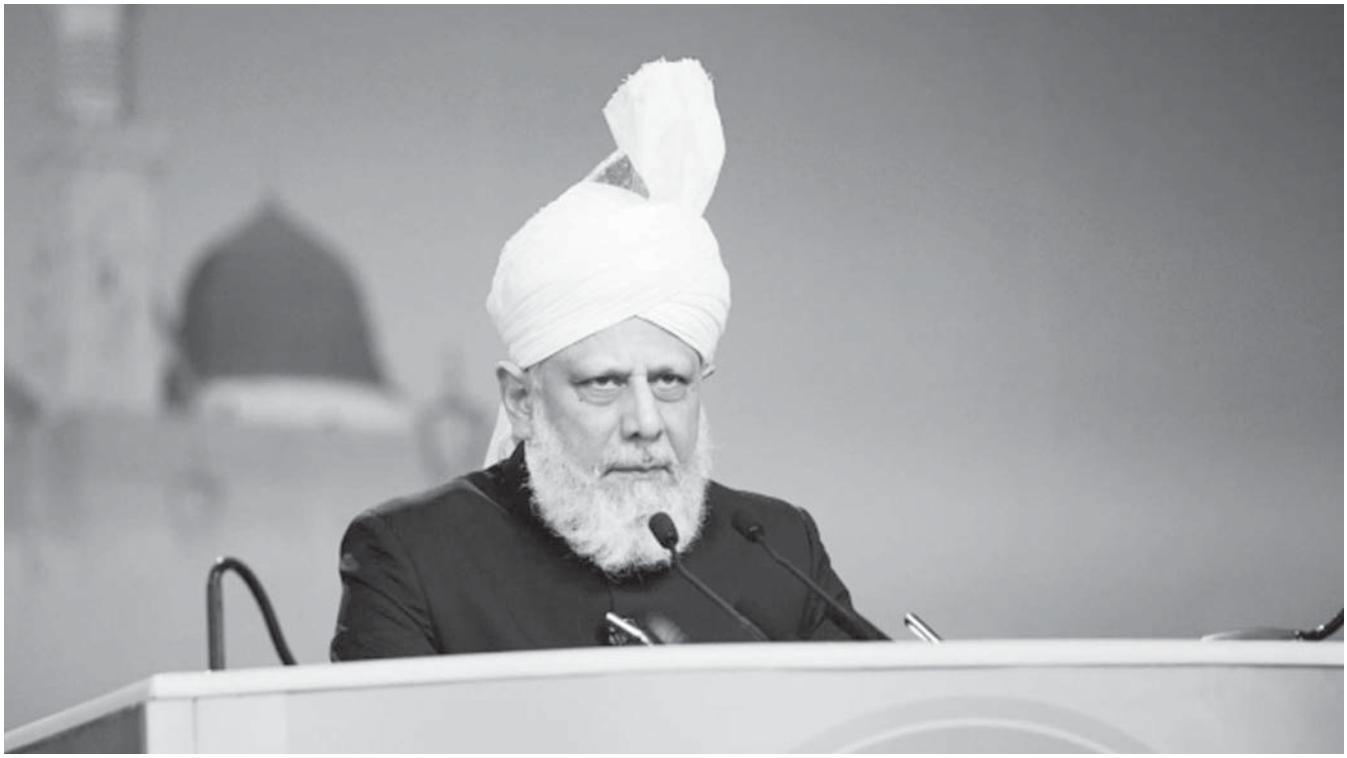

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর ২০১২-এর ঈদুল আযহার খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজও আমি গতকালের খুতবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করবো বা তার অংশ বিশেষের ধারাবাহিকতায় খুতবা দিব।

মুসলমানদের সেই অবস্থা যেমনটা আমি উল্লেখ করেছিলাম, সেই যুগে এমন ছিল, প্রত্যেকেই চিৎকার করে আহাজারি করছিল বা এই ঘোষণা করছিল এবং তাদের অবস্থা এমনই ছিল যে, কেউ যেন তাদেরকে উদ্ধার করতে আসে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা উচু করে, এমন কারো আগমন যেন ঘটে, যে তাদের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সঞ্চার করে এবং তাদের হৃদয়ে মানবতাবোধ জাগ্রত করে, আর তাদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব দ্বিতীয়বার পুণ:প্রতিষ্ঠা করে। কেউ যেন আসে আর তাদেরকে একই উম্মতভূক্ত করে দেয়। এমন কারো আগমন যেন হয়, যিনি একত্ববাদকে পৃথিবীতে প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

গতকাল আমি হালীর কবিতাগুচ্ছ থেকে একটি পংক্তি পাঠ করেছিলাম। আজ তা থেকে প্রথম দু'টি পংক্তি শুনিয়ে দিচ্ছি, যাতে তিনি তৎকালিন মুসলমানদের অবস্থার এক চাল-চিত্র তুলে ধরেছেন।

না ছ্যরদত রাহি উনকি কায়েম না ইজ্জত
গিয়ে ছোড় সাথ উনকা আকবাল দওলত
হুয়ে এলম দাফন উনসে এক এক রুখসত
মিট্টি খুবিয়া সারি নওবত বা নওবত

অর্থাৎ- না আভিজাত্য অবশিষ্ট ছিল আর না ছিল সম্মান
সেই সাথে হারিয়ে গিয়েছে সকল ধন-সম্পদ
জ্ঞান-বিজ্ঞানও নিল তাদের থেকে বিদায়
যা কিছু ছিল তাদের প্রশংসনীয় সবটাই হলো মাটি।

অতএব, এই ছিল তাদের অবস্থা। এই পংক্তি যদি আপনারা পাঠ করতে থাকেন তাহলে দেখবেন এর প্রতিটি পংক্তি এবং সকল কবিতা শুধু তৎকালীন যুগেরই চিত্র তুলে ধরে না বরং বর্তমান যুগের অবস্থার চিত্রও অঙ্কন করে রেখেছে। আজও প্রত্যেক মুসলমান, হোক সে মুসলিম নেতা বা সাধারণ মুসলমান। প্রত্যেকেই এই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত যে, কিভাবে বেশি থেকে বেশি লাভ সে করবে। পূর্বে কেবল মাত্র তো নেতারা, রাজনীতিবিদরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতো, কিভাবে প্রভাব অর্জন করা যায়, আর ক্ষমতা দখল করে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির বাসনাও তাদের ছিল। বর্তমানে ক্ষমতার মোহে ধর্মের নামে ধর্মীয় পণ্ডিত আলেমরাও পৃথক দল বানিয়ে নিয়েছে। প্রথমে ফির্কাগত পার্থক্যের কারণে এরা একে অপরের শিরোচ্ছেদ করতো আর এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দলের নাম, তথাকথিত জেহাদের নামে কলেমা পাঠ কারীদেরকে হত্যা করছে আর নিজেদের ভ্রান্তিপূর্ণ যে রীতি-নীতি আছে তা সংশোধনের জন্য কোন চেষ্টাও করছে না।

সংশোধনের অযোগ্য তাদের এই যে অবস্থা, তা হালী তার পংক্তিতে একশ' বিশ বা পঁচিশ বছর পূর্বে অঙ্কন করেছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, বাস্তবে আজো তা-ই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বরং গভীরভাবে ভাবলে ও দৃষ্টিপাত করলে এর চেয়েও অধিক ভয়ানক এক চিত্র ফুটে উঠে। একটি শ্রেণীকে লোভ লালসা এবং শাসন ক্ষমতা আরও বেশি অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আর অনেক বেশি অন্ধও হয়ে গেছে এই লোকেরা। হালী তার পংক্তিতে যথার্থই লিখেছেন-

নেহি তাজেগিকা কহি নাম জিস পার
হ্যরি ঢনিয়া ঝড় গেয়ি জিসকি জ্বলকর

সজীবতার লেশ মাত্র নেই যাতে; শুষ্ক শাখা-প্রশাখা তা থেকে তো ঝরেই যাবে।

অতএব, অনুতাপকারী প্রত্যেক মুসলমানের সকাতর এই ধ্বনি আজো উঠছে। আর এতে হতাশাও এভাবে প্রকাশ করা হয় যে, হয়তোবা আমরা এখন আর সংশোধনের যোগ্য নই। কিন্তু এটি এই কারণে যে, আল্লাহ্ তা'লার আহ্বানে কর্ণপাত করা হচ্ছে না আর জেনে বুঝেও আলেমরা আর নেতৃবর্গরা জনসাধারণের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর যারা আহাজারি করতো তারাই আজ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আহ্বান শুনে আগমণকারীকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষরা তো সেই লোকদেরই কথা মেনে চলে যারা মিথ্যা কথা বলে, অথচ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে আহ্বানকারী এসেছেন তাঁর আহ্বানের প্রতি তারা কান দেয় না। শুধু এতটুকুই নয় যে কর্ণপাত করছে না, বরং তার বিরোধিতায়ও সব সীমা লঙ্ঘন করছে। আহমদীদের ক্ষতি করার জন্য সব ধরণের বৈধ অবৈধ কাজের জন্য তারা প্রস্তুত আছে এবং তা করেও চলছে। ব্যবসায়ী লোক হয়ে থাকলে আহমদীদের মূলধন আটকিয়ে দেয় আর লভ্যাংশ দিতেও অস্বীকার করে বসে। এমনকী অবশিষ্ট মুলধন ফেরত দিতেও গড়িমসি করে। এ সম্পর্কিত বিধান তারা জানে, আর ভালো রূপে জানা থাকা সত্ত্বেও হারাম ভক্ষণ করছে আর পরে বলে থাকে যে, আহমদীদের সম্পদ লুট-পাট করা, তাদের থেকে হারাম খাওয়াও পুন্যের কাজ। এই শিক্ষাই তাদের আলেমদের, যা তারা লোকদেরকে দিয়ে থাকে।

হালী এমন ভুল শিক্ষা প্রদানকারী উলামা এবং অত্যাচারী নেত্রীবর্গ সম্পর্কেই হয়তো একথা বলেছেন যে, এটা এমনই, যা ভস্মীভূত হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ সেই বৃক্ষ, যা ছিল ছায়া প্রদানকারী, জ্বালানোর যোগ্য হয়ে গেছে সেই সব। সেই সকল উলামা যারা ধর্মের শিক্ষা দান করে আর সেই সকল নেতা যারা জাতির বেদনা অনুধাবনকারী ছিল, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে তারা এমন হয়ে গেছে যে, এর যোগ্যতাই হারিয়ে বসেছে, তাদের কাছ থেকে কেউ এখন আর ভাল কিছু পাওয়ার আস্থা রাখতে পারছে না।

এখন তারা এমন বৃক্ষে পরিণত হয়েছে যে, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ছাড়া তা আর কোন কাজের যোগ্য নেই। এছাড়া আর কোন কাজে তা আসতেই পারে না। কেননা, এই লোকেরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ। এই বৃক্ষ যা রয়েছে তা সত্যিই জ্বালানিযোগ্য হওয়ারই কথা ছিল আর হয়েছেও তা-ই। কেননা এখন কেবলমাত্র সেই বৃক্ষই পৃথিবীতে কল্যাণ পৌঁছানোকারী সাব্যস্ত হতে পারে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে লাগিয়েছেন আর সেই সময়ে এই বৃক্ষ রোপিত হওয়ার কথা, যখন মহানবী (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের এবং তাদের আলেমদের এই অবস্থা হওয়ার কথা, যা আজ হয়েছে। যেজন্য তারা রোদনও করছে।

হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, (এর অর্থ আমি শুনিয়ে দিচ্ছি) অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সেই যুগের লোকদের মসজিদগুলো যদিও বাহ্যিকভাবে আবাদ মনে হবে কিন্তু তা হেদায়াত শূন্য হবে। তাদের আলেমরা আকাশের নিচে বসবাসকারী জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদের মধ্য থেকেই ফিতনা-ফ্যাসাদের উদ্ভব হবে আর তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। (বায়হাকী, মিশকাত) অর্থাৎ এরা সকল প্রকার মন্দ স্বভাবের অধিকারী হবে আর মন্দের উৎসস্থলও হবে এরাই ।

আবার আরেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে- আমার উম্মতের ওপর অস্থিরতা এবং ভীতির এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা তাদের আলেমদের কাছে সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার বাসনায় যাবে কিন্তু সে তাকে বানর এবং শুকরের ন্যায় দেখতে পাবে (কানযুল উম্মাল)। অর্থাৎ অচিরেই আলেমদের নিজ ধর্মীয় অবস্থা এবং চরিত্রও খারাপ হয়ে যাবে, ন্যাক্কারজনক অবস্থা হবে তাদের।

অন্যত্র হযরত ছাই'লবাহ বাহরাইনী বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবী থেকে জ্ঞান তুলে নেয়া হবে। এমনকি জ্ঞান ও হেদায়েত আর বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন শিক্ষা তাদের মাঝে

আজকে বড় ঈদ বা কুরবানীর ঈদ। যার মধ্যে এই সময় মুসলমানদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার পরিবর্তে তার ঘাড়ে ছুড়ি না চালিয়ে যা সেই যুগের প্রচলিত রীতি ছিল, তাকে শেষ করে দিয়েছেন, যেন মানবাত্মাকে কুরবানী করা হয়।

কিন্তু এই ইসলামী দেশগুলোতে মানুষের প্রাণ থেকে পশুর প্রাণকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়। নি:ষ্পাপ প্রাণ, শিশু, নারীদের আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয়। আর এমন হয় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খোঁজই পাওয়া যায় না।

অবশিষ্ট থাকবে না। সাহাবাগণ (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জ্ঞান কিভাবে নি:শেষ হয়ে যাবে যখন আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে আর এটি আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিতে থাকব। এর জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, তাওরাত এবং ইঞ্জিল কি ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের মাঝে বিদ্যমান নেই? কিন্তু তাতে কি তাদের কোন কল্যাণ হয়েছে? অর্থাৎ আমল থাকবে না। আবার ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর ব্যাখ্যাসমূহ যখন আসতে থাকবে তখন কুরআনের প্রকৃত শিক্ষাকেই লোকেরা একেবারে ভুলে বসবে।

এরপর আরেক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'লা লোকদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান ক্ষণিকেই তুলে নিবেন না বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে তা নি:শেষ হবে। যখন কোন আলেম থাকবে না তখন লোকেরা চরম অজ্ঞ লোকদেরকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিবে আর তাদের কাছে গিয়ে নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে আর তারা অজ্ঞতা প্রসূত ফতওয়া দিয়ে দিবে। অতএব, সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে আর অন্য লোকদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

আজকাল, আপনারা এমন টিভি চ্যানেল দেখে থাকবেন যেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত হাসি-তামাশার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। 'ইস্তেখারা' নামে একটি চ্যানেল রয়েছে। তারা সেখানেই বসে পুস্তক খুলে আর বলে দেয় যে, আচ্ছা, এইসব করা হয়েছে, এরপর দু'চারটি প্রশ্নও করা হয়, জানি না কি ইস্তেখারাই বা করল, কিন্তু তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়ে দেয়া হয় যে, তোমার সাথে এমনটা-ওমনটা ঘটবে। অর্থ উপার্জনের অদ্ভুত কৌশল তৈরী করে নিয়েছে তারা।

অত:পর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একটি মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তাঁর কাছে মরুবাসী এক ব্যক্তি আসলো আর জিজ্ঞাসা করলো, কেয়ামতের আগমন কখন হবে? মহানবী (সা.) তার কথার দিকে মনোযোগ না দিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে রইলেন। এতে কিছু লোকের অন্তরে এই ধারণা হলো যে, মহানবী (সা.) হয়তো এই গ্রাম্য লোকের কথা শুনেছেন কিন্তু পছন্দ করেননি। আর কিছু লোক এমন ধারণা করেছে যে, তিনি (সা.) হয়তো তার কথা শুনেন নি। কিন্তু মহানবী (সা.) কথা বলা যখন শেষ করলেন, তখন সেই গ্রাম্য ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং বললেন, কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? গ্রাম্য ব্যক্তিটি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। এরপর তিনি (সা.) বললেন, উত্তর শুনে নাও। অধ:পতনের জন্য উম্মতের মধ্যে আমানতদারী যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কিভাবে শেষ হয়ে যাবে? তিনি (সা.) বললেন, যখন অযোগ্য এবং অনুপযুক্ত লোকদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেয়া হবে। অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতা, বেঈমান এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এসে যাবে আর নিজেদের বেঈমানী এবং অযোগ্যতার কারণে তারা জাতিকে ধ্বংস করে দিবে। আর এমনটাই আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আজ কোন একটি মুসলিম দেশও এই অবস্থার ব্যতিক্রম নয়।

অতএব, এই সব কিছুই যখন বর্তমানকালের আলেম এবং নেতাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন আর এটা সত্য প্রমাণিত হয়েই চলেছে, তাহলে কিভাবে এটা হতে পারে যে, সেই লোকদের থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যাবে? তাদের থেকে কিভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা আশা করা যায়? তাদের কাছে কিভাবে আশা করা যায় তারা তৌহীদের পথে পরিচালনাকারী হবে? কিন্তু মুসলমান, অন্যান্য নবীর উম্মতের ন্যায় নয়, যাদের সঠিক পথ লাভের কোন ভরসা নেই। যাদের জন্য আজ কেবলমাত্র নৈরাশ্য আর হতাশা বিরাজ করছে। যাদের ধর্মের মধ্যে ব্যাধি সৃষ্টি হলে তা শুধরানোর জন্য কেউ নেই, সঠিক এবং মৌলিক শিক্ষাকে ভুলে বসাই কি তবে তাদের জন্য অবধারিত? না, মুসলমানতো সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের মধ্যে এইসব অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও যার চিত্র মহানবী (সা.) অঙ্কন করেছেন আর যা আমি হাদীসের আলোকে বর্ণনা করেছি।

তিনি (সা.) এই আশ্বাসও দিয়েছেন বরং নিশ্চয়তা দিয়েছেন, খোদা তা'লা উম্মতের এবং সকল মানবজাতির সংশোধনের জন্য আখারীনদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি ঈমানকে সপ্তর্ষী মন্ডল থেকে পুণরায় পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন। ইসলামের হারানো সৌন্দর্যকে দ্বিতীয়বার

দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারপর সকল মুসলমানকে এবং পুণ্য স্বভাবের লোকদেরকে এক হাতে একত্রিত করে মহানবী (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত করবেন। আর তাদেরকে একই উম্মতভূক্ত করবেন। তারা মহানবী (সা.)-এর খাঁটী প্রেমিক হবেন।

অতএব, মহানবী (সা.)-এর এই বাণীর প্রতি কর্ণপাত করা উচিৎ। এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এই জন্য জরুরী যে, ঈমানকে সপ্তর্ষী মন্ডল থেকে ফিরিয়ে আনা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে।

এটা যখন প্রমাণিত এক বাস্তবতা, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধর্মের ঠিকাদারদের এবং তথাকথিত আলেমদের পরিণতি দৃশ্যমান, সেক্ষেত্রে এর চিকিৎসা পদ্ধতিও তো তিনিই (সা.) বাতলে দিয়েছেন, এর প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী, নইলে মাথা ঠুকে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁর আগমণ ছাড়া আর কারো আগমণ ঘটবে না যিনি ইসলামের দ্বিতীয় কুদরতকে পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন, বা বলতে পারেন যার সাথে ইসলামের পুন: জাগরণ সম্পৃক্ত।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আনুমানিক অর্ধেক পৃথিবীতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি সংগঠনও রয়েছে কিন্তু ইসলামী বিশ্বে এই ব্যবস্থাপনার প্রভাব কতটুকু রয়েছে? কোন ধরণের প্রভাব কি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে? এটা হওয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল যে, অ-মুসলিম বিশ্বের উপর এই সংগঠনের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু হচ্ছেটা কি? নিজেদেরই দেশে অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেই তাদের কথা মান্যকারী কেউ নেই। মুসলিম দেশগুলোতো নিজেদের কর্মপদ্ধতির জন্য একটি সংগঠন বানিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে আর নিজেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু এর সদস্য যারা প্রত্যেকেই চলছে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রাস্তায়।

তারপর দেখুন, জঙ্গি সংগঠন যতগুলো রয়েছে, এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে। হত্যা ও আত্মঘাতি হামলার মত জঘন্য কার্যকলাপ যা আছে তা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইসলামী দেশগুলোতে। ব্যক্তিগত শক্তির দাপট প্রকাশ করার জন্য আর ইসলামী দেশগুলোতে নিজেদের ক্ষমতা বজায়ে রাখার জন্য সাধারণ জনগণের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, তাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদের জীবনকে পশুর চেয়েও হেয় মনে করে হত্যা করা হচ্ছে আর লুণ্ঠন করা হচ্ছে তাদের ধন সম্পদ। কিছুতো এসব নিজেদের ক্ষমতার লোভে করছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি দুর্ভাগ্য হলো, এইসব অত্যাচার খোদা তা'লার নামেই করা হচ্ছে। ধর্মের নামে রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে। রাসূলের নামে, হ্যাঁ, সেই রাসূলের (সা.) নামে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাঁরই নামে অত্যাচারের এই উপাখ্যান রচিত হচ্ছে।

আজকে বড় ঈদ বা কুরবানীর ঈদ। যার মধ্যে এই সময় মুসলমানদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার পরিবর্তে তার ঘাড়ে ছুড়ি না চালিয়ে যা সেই যুগের প্রচলিত রীতি ছিল, তাকে শেষ করে দিয়েছেন, যেন মানবাত্মাকে কুরবানী করা হয়। এই শিক্ষা দেয়া হয় এখন থেকে মানুষের পরিবর্তে পশু জবেহ করা হবে। কিন্তু এই ইসলামী দেশগুলোতে মানুষের প্রাণ থেকে পশুর প্রাণকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়। নি:স্পাপ প্রাণ, শিশু, নারীদের আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয়। আর এমন হয় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খোঁজই পাওয়া যায় না আর চেনাও যায় না যে, শরীরের অঙ্গ কোনটি কোথাকার আর কোথায় গিয়েছে। ঘর থেকে একটি শিশু বের হলে পিতা-মাতার জানা থাকে না যে, রাতে সে ঘরে ফিরে আসবে, নাকি আসবে না। আর যদি কোনভাবে ফেরত এসেও যায়, তাহলে আশঙ্কা থাকে তার লাশ সনাক্ত করা যাবে কি না?

ঈদের দিনেও এই অন্যায় কাজ করা হচ্ছে। গতকাল আফগানিস্তানে এমনইভাবে ঈদের দিনে হামলা করা হয় আর কয়েক ডজন মানুষকে হত্যা করা হয়। সিরিয়ার অবস্থাও আজকাল খারাপের দিকে যাচ্ছে। সিরিয়াতে না সরকার ন্যায়ের সাথে কাজ করছে, আর না সরকার বিরোধীরা। এটা বলা হচ্ছে যে, এসবের মধ্যে জঙ্গি সংগঠনগুলোও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ বিবেক-বুদ্ধির সাথে কাজ করছে না। বিবেকতো দূরের কথা, নিজেদের কর্মে আর নিস্পাপদের প্রাণ হরণের ক্ষেত্রে এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করছে। আর এহেন অবস্থা, কোন একটি দেশের বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় বরং যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজ করছে।

পাকিস্তানে প্রত্যেক দিন কয়েক ডজন মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আফগানিস্তানেও ডজন ডজন প্রাণ যাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য দেশ, যেমন– আফ্রিকার দেশসমূহেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। আরব দেশেও একই অবস্থা, আর এসব কিছু হচ্ছে শরীয়ত এবং ধর্মের নামে, এভাবে ইসলাম বিরোধীদেরকে ইসলাম-কে পরিহাস করার ও আপত্তি উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

গত দিনগুলোতে চৌদ্দ পনের বছরের এক মেয়ে মালালার ঘটনা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশ্বে ইসলাম বিরোধিদের আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। এই জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছে, গুলি করে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ, সে কিছু জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে সঠিক কথা লেখা-লেখি করত।

একারণে আক্রমণকারীরা বলে, কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা কুরআনে এক ছেলের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় যে, সে বড় হয়ে বিদ্রোহী হতো তাই নবী তাকে হত্যা করে ফেলেছেন। সূরা কাহাফের ঘটনার দিকে হয়তো তারা ইঙ্গিত করে থাকে। প্রকৃত জ্ঞানতো তাদের নেই আর যেই মসীহ মাওউদ প্রকৃত শিক্ষা দেয়ার ছিল তাকে তো তারা মান্য করার জন্য প্রস্তুতও নয়। এরাতো শুধু বাহ্যিক জিনিষ দর্শন করে আর তার পিছনেই ছুটে। সেই হত্যাতো ছিল নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষার হত্যা। নিজের সংশোধন করা ও আত্মসংশোধন করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

যাই হোক, এখন আমি সেই প্রেক্ষাপটের দিকে যাচ্ছি না। তবে এটা অবশ্যই বলছি, এটা তাদের বৈশিষ্ট যা কেবল অত্যাচারের চরম সীমায় উপনিত হয়েছে, আর এতে ইসলাম বিরোধীদের সুযোগ তৈরী করে দেয়া হচ্ছে। কেননা যারা ইসলাম বিরোধী তারা এসব থেকে সুযোগ গ্রহণ করে। আর

এসবই দুষ্ট-বুদ্ধির পরিকল্পিত কাজ।

সেখানে, পাকিস্তানে অথবা বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেহ মালালা'র মত কতই না আক্রান্ত হচ্ছে। এমন মালালা কতনা রয়েছে, যার বোন অথবা ভাই, পিতা অথবা মাকে হত্যা করা হচ্ছে আর না তাদের কাউকে চিকিৎসার জন্য বাহিরে পাঠানো হয়েছে, আর না তাদের সমর্থনে ততোটা আওয়াজ তোলা হয়েছে। তো এটাও একটি পরিকল্পিত স্কিম হতে পারে কিন্তু এর ভিত মুসলমানরা নিজেরাই রচনা করেছে। তারপর শুধু দেশের ভিতরেই নয় বরং মুসলিম দেশগুলোর সম্মান ও মর্যাদা বাহিরেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা, একতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকার কারণে এদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, মুসলিম দেশগুলোর জন্যই নি:সন্দেহে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কিন্তু তা একেবারেই বেকার। প্রয়োজনের সময় তারা অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন তুর্কি এবং সিরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করছে। উভয় দিক থেকেই বিভিন্ন সময় আক্রমণ করা হচ্ছে। সেখানে নিষ্পাপ নগরবাসী প্রাণ হারাচ্ছে কিন্তু সার্বিকভাবে যে কথাটি আমি এখন বলতে চাচ্ছি তা এখানকার এক বিশ্লেষক লিখেছেন, অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলোর কথায় অর্থাৎ আমেরিকার কথায় তুর্কিরা আক্রমণ চালাচ্ছে আর প্রত্যেক হামলার পূর্বে আমেরিকার কাছ থেকেই তারা দিক-নির্দেশনা নিয়ে থাকে। তো এই হচ্ছে ইসলামী দেশগুলোর হাল-হকিকত। আমেরিকার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তারা এমনটা করে, এই কথার সত্যতা কতটুকু রয়েছে, খোদা তা'লাই ভালো জানেন। কিন্তু সেই দেশগুলোর লেখকদের একথা বলার সাহস এ জন্যই হয়েছে যে, তারা জানে, ইসলামী দেশগুলোর নিজেদের কোন শক্তি নেই আর পশ্চিমা বিশ্বের মুখ-পানে এরা চেয়ে বসে থাকে।

এই সবকিছু এ জন্যই হচ্ছে, একত্ববাদের যে শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে মহানবী (সা.) এসেছিলেন, তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু*** তাদের জিহবার মধ্যে নি:সন্দেহে আছে কিন্তু অন্ত:সারশূন্য। সেই মহান রাসূল (সা.), যিনি পবিত্র কাবাগৃহ থেকে মূর্তি অপসারন করেছিলেন, আজকে ক্ষমতার মোহ এবং লোভের সেই মূর্তিকেই হৃদয়ে স্থান দিয়ে রাখা হয়েছে। এমনই যদি হয়, তাহলে কিভাবে এই লোকেরা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? বাহ্যিকভাবে হজ্ব পালন করা হচ্ছে কিন্তু হৃদয় হয়তো অন্য কোন 'কাবা'র তোয়াফ করছে। এদের মধ্য থেকে অধিকাংশের একই অবস্থা। বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার কেবল একজন ব্যক্তির হজ্ব গ্রহণ করা হয়েছিল আর সেও তিনি ছিলেন, যিনি হজ্বে যান নি। তো এই উদাহরণ পুরাতন নয়। বর্তমানে এমন উদাহরণ পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, যখন কিনা কেবল লোক দেখানো হজ্বে যাওয়া হয়। এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, কার হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে আর কারটা নয়।

হজ্ব পালনের ক্ষেত্রে আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, যেই আহমদীদের হৃদয়ে হজ্ব করার জন্য ব্যকুলতা রয়েছে আর হজ্ব করতে যেতে পারছে না, তাদের হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে, না তাদেরটা যাদের অধিকাংশই জুলুম ও অন্যায় করে হজ্বে চলে যায়। তৌহীদের প্রকৃত মর্ম এবং উদ্দেশ্য এই লোকেরা ভুলে বসেছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। অতপর এক মহান নবীর আগমণের জন্য দোয়া করেছিলেন, যিনি পৃথিবীতে তৌহীদের বাণী পৌছাবেন। এক খোদার সামনে মাথা নতকারী সৃষ্টি করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মুসলমানের আসল অবস্থা এমন যে, দৃশ্যত: তৌহীদের ঘোষণা করে ঠিকই কিন্তু শত কোটি শিরকের মধ্যে পরে রয়েছে। আর এই শিরককে পুণরায় শেষ করার জন্য মহানবী (সা.) তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী মসীহ-মাহদীর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ঈমান প্রতিষ্ঠা করার কথা, হৃদয়ে লালিত মূর্তি এবং বাহ্যিক মূর্তিকে ভেঙ্গে যিনি সেই একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করবেন যা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মহানবী (সা.)-এর আগমণ হয়েছিল। আর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই সাধন করেছিলেন তিনি (সা.), আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্যও এটিই।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তৌহীদ প্রতিষ্ঠার এবং বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য এবং এখান থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিস্তার করার জন্য নিজের বংশধরদের মধ্য থেকে এক মহান নবী প্রেরণের জন্য দোয়া করেছিলেন যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করেছিল আর সেই মহান নবী প্রতিমার সামনে মাথা নতকারীদেরকে এক খোদার সামনে মাথা নতকারীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বংশ পরম্পরায় যারা শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিল তাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার দূতে পরিণত করেছিলেন।

এই মহান নবী নিজ মহান উদ্দেশ্যকে কিয়ামত পর্যন্ত বহমান রাখার জন্য এক একনিষ্ঠ প্রেমিকের সংবাদ দিয়েছেন। যাকে মহানবী (সা.) ভালবেসে ***'আমাদের মাহদী'*** বলে সম্বোধন করেছেন।

অতএব, সেই মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবকের আগমণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন ইসলামের হারানো সৌন্দর্যকে দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যেই ধর্মকে, তাঁর (আ.) যুগে, যারা ইসলামের জন্য হৃদয়ে ব্যথা রাখতো তারা একে বিরান গৃহের সাথে তুলনা করতো, তিনি (আ.) ইসলামকে নতুন আঙ্গিকে আবার মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, হে ইব্রাহীম! তোমার প্রতি সালাম, আমরা তোমাকে প্রিয়দের মধ্য থেকে পছন্দ করেছি। আল্লাহ্ তোমার সব কাজ পূর্ণ করে দিবেন আর তোমার সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করবেন। তুমি আমার পক্ষ থেকে এমনই, আমার একত্ববাদ এবং আমার একমে বা দ্বিতীয়ম যেমন।

অতএব, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সেই একনিষ্ঠ সেবক সেই মর্যাদা লাভ করেছে, তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের কল্যাণে হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ে তার এতটাই ব্যথা ছিল যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনি (আ.) এতটাই গ্রহণীয় হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইব্রাহীম বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর প্রতি শান্তির বাণী পাঠিয়েছেন।

অত:পর আরেক ইলহামের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ***'গারাস্‌তু লাকা বেয়াদি***

হজ্ব পালনের ক্ষেত্রে আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, যেই আহমদীদের হৃদয়ে হজ্ব করার জন্য ব্যকুলতা রয়েছে আর হজ্ব করতে যেতে পারছে না, তাদের হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে, না তাদেরটা যাদের অধিকাংশই জুলুম ও অন্যায় করে হজ্বে চলে যায়।

রাহমাতি ওয়াকাদারতি ওয়া ইন্নাকাল ইয়াওমা লাদাইয়ানা মাকিনান আমীন'। আমি নিজের হাত দিয়ে নিজ অনুগ্রহ ও কৃপার বৃক্ষ তোমার জন্য রোপন করেছি। আর তুমি আজকে আমাদের দৃষ্টিতে পদমর্যাদার অধিকারী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অতএব, এটিও বলেছেন যে, 'দোহাতা ইসমাইল' অর্থাৎ ইসমাইলের বৃক্ষ তুমি। অভিধানে 'দোহা'র এক অর্থ এটিও লেখা রয়েছে যে, 'দোহা' এমন বৃক্ষকে বলে যা আকারে বিরাট ও বিস্তৃতিতে বিশাল।

অতএব, এই বৃক্ষ যা আল্লাহ্ তা'লা লাগিয়েছেন এটি ফুলে ফলে সুশোভিত হবে এই জন্য যে, পৃথিবী যেন জানতে পারে, যেই বৃক্ষ হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) দোয়ার মাধ্যমে লাগিয়েছিলেন, যা সমগ্র পৃথিবীকে নিজ ছায়ার নিচে নিয়ে এসে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করার কথা ছিল এবং করেছেও তাই। অর্থাৎ সেই মহান রাসূল (সা.) প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর শিক্ষা শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর বৃক্ষসদৃশ আলেমরা, যেভাবে হালী বলেছিলেন যে, এটি জ্বালানোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে বরং এই বৃক্ষ সেই একনিষ্ঠ প্রেমিকের মাধ্যমে পুণরায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠেছে। হ্যাঁ, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই বৃক্ষের মূল থেকে এমনই এক বৃক্ষের জন্ম হয়েছে যা মূল গাছের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তার ছায়া প্রদানকারী গাছ যা একত্ববাদের ফলের সাথে পৃথিবীকে পরিচিতি প্রদানকারী। এখন মৌলবীরা যত চিৎকার করুক আর যত পারে আহমদকে মুহাম্মদ (সা.) থেকে পৃথক করার জন্য চেষ্টা করুক।

এই বৃক্ষ ছাড়া আর কোন স্থান থেকে সেই কল্যাণ পৌঁছানো সম্ভব নয় যা মহানবী (সা.)-এর উভয় বৈশিষ্ট অর্থাৎ 'মুহাম্মদ' এবং 'আহমদ' এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। বিরোধীরা বিগত একশত পঁচিশ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কি লাভ হয়েছে তাদের? শুধু হৈচৈ করে নিজেদেরই বদনাম কুড়িয়েছে তারা! মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক এর মাধ্যমে যেই বৃক্ষ খোদা তা'লা নিজ হাতে লাগিয়েছেন, তার শাখা-প্রশাখা পৃথিবীর কোনায় কোনায় যখন বিস্তৃতি লাভ করছে, এর গায়ের ওপর বিরোধিতার ঝড় যা আসে তা সেই বৃক্ষের ডালপালা গুলোকে কিছু হেলিয়ে দেয় কিন্তু গাছের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

অতএব, এখনো কি এই আলেমরা এবং তাদের অনুসারীরা চোখ মেলে দেখবে না? হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ময়দানে আমাকে সফলতা দান করেছেন আর শত্রুরা অপদস্থ হয়েছে, আমার বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া লাগানো হয়েছে, হত্যার মামলা করা হয়েছে, কয়েকবার আমার ধ্বংসের জন্য এমন কোন চেষ্টা নেই যা তারা করে নাই, কিন্তু খোদার সাথে কি কেউ যুদ্ধ করতে পারে? আমাদের উন্নতির কারণ এই বিরোধীরাই, অনেকে তাদের পত্র-পত্রিকা থেকে অবগত হয়, অনেক লোক তাদের ভুল বুঝতে পেরে বয়আত করেছেন। (আর এটি আজও একইভাবে ঘটে চলেছে। অনেক আরববাসী যারা আহমদী হচ্ছে তারা পত্র লিখছে যে, আমরা বিরোধী ওয়েবসাইট এবং টিভি চ্যানেল দেখে আর মৌলবীদের সাথে আলোচনা করে আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে আর আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে খোঁজ খবর নেই। তারপর একে সত্য পেয়ে তারা গ্রহণ করেছে।)

অত:পর তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে যদি বাগ্মীতাপূর্ণ কিছু করা হতো তাহলে আমাকে তার জন্য গর্বিত হতে হতো আর এটাও এক ধরণের অংশীবাদীতা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এথেকে রক্ষা করেছেন। একজন কৃষক নিজে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চনের কাজ করেন আর খোদাও তাঁর নিজের কাজ নিজেই করেন।

আমি এবং আমাদের জামা'ত খোদা তা'লার সাহায্যপুষ্টের মাধ্যমে উদগত। খোদা তা'লার লাগানো চারা গাছকে কার সাধ্য আছে একে উপড়িয়ে ফেলে? অত:পর আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, আমার উপর খুব কম রাতই এমন অতিবাহিত হয় যাতে আমাকে এই সান্তনা দেয়া হয় না যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং আমার আসমানী সৈনিকরা তোমার সাথে আছে। যদি কারো হৃদয়ের পবিত্রতা থাকে তাহলে সে মৃত্যুর পর খোদাকে দেখতে পাবে। কিন্তু সেই খোদার পবিত্র চেহারার কসম, আমি এখনও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবী আমাকে চিনতে পারছে না কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এটি সেই লোকদের ভুল ধারণা এবং তাদের দুর্ভাগ্য যে, এরা আমার

প্রত্যেক কুরবানীর ঈদ আমাদেরকে এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় যে, সেই বৃক্ষকে পানি সিঞ্চনে সর্বদা সতেজ ও সজীব রাখতে আমরা যেন আমাদের প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মানকে শুধু প্রস্তুতই না রাখি বরং যখনই যে জিনিষের প্রয়োজন হবে আমরা তা নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করে দিব।

ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ, যার প্রকৃত মালিক নিজ হাতে এটিকে লাগিয়েছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করতে চায় সে কারুন, ইয়াহুদ, উসকার, ইউতি এবং আবুজাহলের পরিণতি থেকে কিছু অংশ নিতে চায় বৈকি। আমি প্রতিনিয়ত এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যে কোন ময়দানে বের হউক আর মিনহাজে নবুওয়াতের মানদন্ডে আমাকে যাচাই করুক আর এর পর দেখুক, খোদা কার সাথে আছেন।

অতএব, এর মাঝে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লার লাগানো বৃক্ষকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা মহানবী (সা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী এই একনিষ্ঠ প্রেমিকের মাধ্যমে খোদা তা'লার তৌহীদ এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার এবং তার প্রতিষ্ঠা হওয়া নির্ধারিত ছিল। তবে প্রত্যেক কুরবানীর ঈদ আমাদেরকে এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় যে, সেই বৃক্ষকে পানি সিঞ্চনে সর্বদা সতেজ ও সজীব রাখতে আমরা যেন আমাদের প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মানকে শুধু প্রস্তুতই না রাখি বরং যখনই যে জিনিষের প্রয়োজন হবে আমরা তা নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করে দিব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখানে এই কথার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই যে, জামা'তবদ্ধ হয়ে কুরবানী করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং জামা'তের সকলে ***'মিন হাইসুল জামা'ত'*** অর্থাৎ সম্মিলিতভাবেও সবাই কুরবানী করে যাচ্ছে। একে অপরের জন্যও কুরবানীর মন-মানসিকতা থাকা চাই। অপরের প্রয়োজনে নিজেকে নিবেদিত রাখার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিৎ।

এই প্রেরণা যদি আমাদের জামা'তে উন্নতি করতে থাকে তাহলে জামা'তের অনেক অভ্যন্তরীন কোন্দল আপনা থেকেই নি:শেষ হয়ে যাবে। কিছু মানুষ বলে থাকে যে, আমাদের প্রাপ্য অধিকার এজন্য আমাদেরকে নিতেই হবে। অন্য যারা রয়েছে তারাও বলে যে, আমাদেরও অধিকার রয়েছে আর তা প্রমাণ করতে তা নেয়ার জন্য চেষ্টা করে। দু'জনই একই কথার উপর বিবাদ করতে থাকে আর এতে উন্নয়ন কর্মের জন্য নির্ধারিত যে সময় সীমা তা শেষ হয়ে যায়, উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলে। দু'জনেই যদি রাগের বশবর্তি হয়ে কাজ করে তাহলে কোন দিন আপোস-রফা হতে পারে না।

অতএব, খোদা তা'লার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস রাখলে, তিনি সব ধরণের ক্ষতি পুষিয়ে দেন। আর সেই বিশ্বাসে আস্থাশীল হলে, আমাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তাদানকারী বৈশিষ্টের ধারক হয়ে নিজের অধিকারকেও যদি ছাড়তে হয়, তাহলেও তা ছাড়া উচিৎ। এমন চিন্তা-ভাবনা যখন সৃষ্টি হবে তখন দেখবেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের মাঝে ঈমানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এইসব কথা অনুধাবনের তৌফিক দিন, আর সব ধরণের কুরবানী প্রদানকারী হওয়ার সামর্থ্য দান করুন । চার হাজার বছর পূর্বের কুরবানীর শিক্ষা ঈদের দিনে শুধু একটি ছাগল কুরবানী করার মাধ্যমে গ্রহণ করবেন না বরং সেই কুরবানীকে আজও সর্ব ক্ষেত্রে প্রবহমান রাখায় সচেষ্ট হউন। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

এখন (খুতবা সানীয়ার পর) দোয়া করা হবে। আর দোয়ার মধ্যে শহীদদের পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন যারা এই বৃক্ষকে সতেজ রাখার জন্য নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, নিজের জানের কুরবানী দিয়েছেন। আসিরানে রাহে মাওলাদেরকে (আল্লাহর পথে বন্দি) স্মরণ রাখবেন, তারা অনেক দিন ধরে কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন।

সৌদী আরবেও রয়েছেন আর পাকিস্তানেও রয়েছেন। মালি কুরবানীকারীদেরকেও স্মরণ রাখবেন, ওয়াকেফে জিন্দেগীদেরকে স্মরণ রাখবেন, তারাও বিভিন্ন স্থানে কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক অসুস্থ এবং কষ্টে নিপতিতদেরকেও স্মরণ রাখবেন, মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করবেন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি দেন এবং বিবেক-বুদ্ধি দান করেন আর এভাবে সকল মানবকুলের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করুন।

ভাষান্তর: মাহমুদ আহমদ সুমন

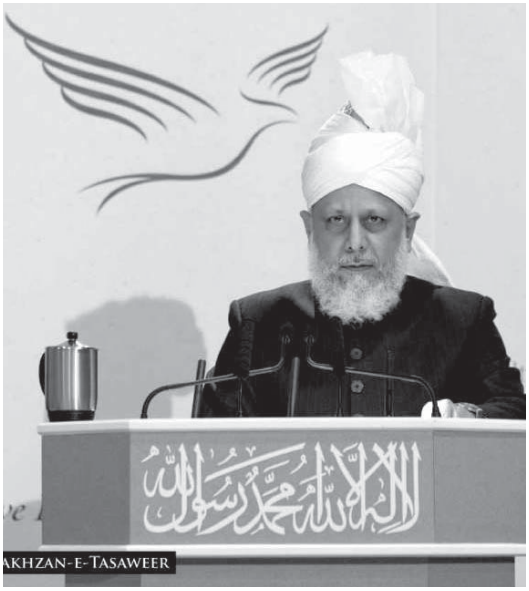

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১২ জুলাই ২০১৩-এর (১২ ওয়াফা, ১৩৯২ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝١٨٤

উক্ত আয়াতের অনুবাদ হল, হে লোকেরা! যারা ইমান এনেছ, তোমাদের ওপর রোযা সেভাবে ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। (সূরা বাকারা-১৮৪)

এখানে খোদা তা'লার কৃপায় আগামীকাল থেকে রমযান শুরু হচ্ছে। খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা তিনি আমাদেরকে আরও একটি রমযান পাড়ি দেবার সুযোগ দিচ্ছেন। উক্ত আয়াত যেটি তিলাওয়াত করা হয়েছে সেখানে খোদা তা'লা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য রোযার গুরুত্ব এবং আবশ্যকীয়তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সাথে এটিও বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের পূর্বে যে নবীদের জামা'ত বিগত হয়েছে, তাদের প্রতিও রোযা ফরয করা হয়েছিল এর কারণ হল, রোযা ঈমানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং রোযা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। এ যুগেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, এখনও বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সেই প্রকৃত অবস্থা বিরাজমান যেরূপ নবীদের সময় ছিল। অথবা যুগের সাথে সাথে রোযার অবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে কিন্তু কোন না কোন বর্ণে বা কোন না কোন অবস্থায় রোযার ধারণা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। হযরত মূসা (আ.)-এর রোযার উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযার উল্লেখ পাওয়া যায়, হিন্দুদের মাঝেও রোযার ধারণা আছে। যদিও তা আগুনে রান্না করা খাবার থেকে বিরত থাকার রোযাই হোক না কেন। খ্রিষ্টানদের কতক ফিরকাও রোযা রাখে সেক্ষেত্রে তারা মাংস খাবে না, কিন্তু সব্জি ইত্যাদি যত খুশি খেতে পারে।

বিগত দিনে আমারও এমন এক রোযাদারকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমাদের একজন খ্রিষ্টান বন্ধু আছেন, তার নাম উল্লেখ করার প্রশ্নই ওঠে না বরং দেশের নামও উল্লেখ করছি না। মোটকথা এ বন্ধু কোন এক দাওয়াতে আমার পাশে বসে ছিলেন। আমি দেখলাম তার সামনে খাবারের প্লেট আসলো না। প্লেটে করে খাবার সার্ভ (Serve) হচ্ছিল, ঢেলে দেয়া হচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি খাবেন না? তিনি বলেন আমি রোযা। অতএব আমি তার রোযার সম্মানার্থে নিরব থাকলাম। অবাক হলাম যে, জাগতিক মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বটে, এতদ্বসত্তেও ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল! কিছুক্ষণ পর দেখলাম সবজি ইত্যাদি তার সামনে দেয়া আছে এমনকি ভাতও দেয়া হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনারা আপনাদের রোযায় সবজি-ভাত তো খেতে পারেন তাই না? বলেন, হ্যাঁ, খাওয়া শুরু করছি। যাইহোক তিনি খাওয়া শুরু করলেন। এরপর আমাদের সামনে বড় প্লেটে মুরগির মাংস ইত্যাদি আসা শুরু হলো। আমি তা নিয়ে খাওয়া শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর আমার দৃষ্টি যখন তার প্লেটে গেল, দেখলাম সেখানে মাংসও রাখা আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রোযার ভিতর মুরগির মাংসও চলে? এটিও আপনারা খেতে পারেন? নির্দ্বিধায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, সার্ভকারী বারবার আসছিল আর মুরগীর মাংসের ডিশ আমার কাছে নিয়ে আসছিল, তাই আমার ধর্ম এটাও বলে যে, মেযবান যদি তোমাদেরকে কিছু খাওয়ায় তবে তা তোমরা খেয়ে নাও। তাই আমি খাচ্ছি।

এই হল প্রাচীন ধর্মের ওপর আমলকারীদের রোযার অবস্থা। সব-ই খাচ্ছিল, মজাদার মাংস ছিল, যখন আশ-পাশের লোকদেরকে খেতে দেখল তখন সার্ভকারীরা সম্ভবত দুইজন ছিল, একজনের কাছে

হয়তো রোযার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু অন্যজনের কাছ থেকে খাবার নিয়ে নিয়েছেন। নির্দ্বিধায় নিয়ে নিয়েছেন এবং খাওয়াও শুরু করে দিয়েছেন। মোটকথা তার স্বভাবজাত প্রকৃতি ধর্মের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেল। কারণ (তাদের) বর্ণনাকারী কিতাবে ধর্মীয় বিধান এ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ স্পষ্ট করে লেখা নেই। কিন্তু কুরআন করিম সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখনও সেই প্রকৃত অবস্থাতেই বিদ্যমান এতে কেবল নবীদের রোযার উল্লেখই করা হয় নি, কেবল বুজুর্গদের রোযার কথা নয় বরং মু'মিনদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছে যে যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তবে তোমাদের জন্য রোযা ফরয, এক মাসের জন্য ফরয। সকাল-সন্ধ্যা সকল প্রকার পানাহার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আর এর দ্বারা মু'মিনের কী লাভ হবে? বলেছেন, এর দ্বারা তোমরা তাকওয়া লাভ করবে, তোমরা তাক্বওয়ায় উন্নতি করবে। রোযার মাধ্যমে তোমাদেরকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। লাভ করতে হবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি । নি:সন্দেহে বাইবেলে হাওয়ারীদেরকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়। এছাড়া রোযার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে রোগমুক্তি লাভ হয়। কিন্তু কাফ্‌ফারার দৃষ্টিভঙ্গি, রোযার যে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাকওয়া লাভ, তা নিঃশেষ করে দিয়েছে। অতএব যে ক্ষেত্রে তাকওয়াই লাভ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে রোযার কল্যাণের গুরুত্বই শেষ হয়ে গেছে। আর যখন কল্যাণই লাভ হচ্ছে না তখন রোযা কেবল নামসর্বস্ব রয়ে গেল। এটি নামসর্বস্ব রোযা, ফলে কাচা-পাকা সবজি দিয়ে রান্না করা মাংসের দিকে হাত চলে যায়।

তাই এই হল ইসলামের সৌন্দর্য বরং বলতে পারেন কুরআনের সৌন্দর্য যে না কেবল তালীম দিয়েছে বা আদেশ দিয়েই শেষ বরং এর উদ্দেশ্যও বলে দিয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে কী কী পুরস্কারসমূহ লাভ হবে তারও সুসংবাদ দিয়েছে। এছাড়া ইসলামী শিক্ষাকে সতেজ রাখার জন্য, কার্যকর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ধর্মের সংস্কারক এবং আউলিয়াদের ক্রমধারা বহাল রেখেছে। আর এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ এবং মাহদীয়ে মা'হুদের বিকাশ ঘটিয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য এ শিক্ষার গূঢ়তত্ত্বকে এর প্রকৃত অবস্থায় সঞ্জীবিত রখার বন্দোবস্ত করেছে।

তিনি (আ.) কুরআনী শিক্ষার আলোকে বারবার তাকওয়ার উপর চলার আদেশ দিয়েছেন। রোযার তাৎপর্য্য বুঝার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন: ইসলামের তৃতীয় রোকন হল রোযা। রোযার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লোকেরা অনবহিত। লোকদের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার মাঝেই রোযা সীমাবদ্ধ নয় বরং এর বাস্তবতা এবং প্রভাব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি হয়। মানবীয় প্রকৃতির মাঝে এটি রাখা আছে যে, যতটা কম খাওয়া হয় ততই আত্মা পবিত্র হবে এবং কাশফের শক্তি লাভ হবে।

খোদা তা'লার অভিপ্রায় হচ্ছে, রোযার মাধ্যমে এক খাবার কম করো আর অন্য খাবার বৃদ্ধি করো। রোযাদারদের সর্বদা এটি মাথায় রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকাই কেবল রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং সর্বদা খোদা তা'লার যিকিরে মগ্ন থাকা উচিত যেন ***তাবাত্তুল*** ও ***ইনকেতা*** (জগত ত্যাগ করে সম্পূর্ণ রূপে খোদা তা'লা মুখী হওয়া) লাভ হয়। তাই রোযার উদ্দেশ্য এটি-ই যে, দেহের লালন-পালনকারী রুটিকে পরিত্যাগ করে অন্য রুটি লাভ করবে, যে রুটি আত্মার প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির কারণ হয়। আর যারা কেবলমাত্র খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে রোযা রাখে এবং কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং শুধু মাত্র খোদা তা'লার খাতিরে রোযা রাখে এবং আনুষ্ঠানিক রীতি হিসেবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার হামদ, তাসবিহ এবং তাহলিল-এ লেগে থাকা যার ফলে তারা দ্বিতীয় খাবার লাভ করবে। (মালফুজাত- ৫ম খন্ড পৃ: ১০২, সংস্করণ ২০০৩)

এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইরশাদ করেছেন, মানুষ যতই কম খাবার খায়, আত্মা ততই পরিশুদ্ধ হয়। এর দ্বারা এটি মনে হতে পারতো যে, সম্ভবত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকাই আত্মার পরিশুদ্ধির কারণ হয়। তাই পরবর্তীতে তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, কেবল ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকাই আত্মার পরিশুদ্ধির কারণ হয় না। আর না এর মাধ্যমে রোযার উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। এটি কুরআনী শিক্ষার বিপরীত চিন্তা। কেননা মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া লাভ করা। তাই বলেছেন, যদি রোযা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাখা হয় তখন রোযার সমস্ত সময় যিকরে ইলাহীতে ব্যয় কর। অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার ফলে অনেক যোগীদের মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তারাও কাশফ দেখতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য এটি নয়। এক মু'মিনের জীবনের উদ্দেশ্য হল ইনকেতা ও তাবাত্তুল (জগৎমুখীতা পরিত্যাগ করে একেবারে খোদার দিকে ঝুঁকে পড়া)। যিকরে ইলাহী এবং ইবাদতের মাঝে নিমজ্জতায় এটি সৃষ্টি হয়। আর নামাযসমূহ এর উত্তম মাধ্যম যা আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তা খোদা তা'লার নৈকট্যের কারণ হয়। (মালফুযাত ২য় খন্ড পৃ: ৬৯৬-৬৯৭)

তাই প্রকৃত রোযা সেটিই যেটি খাবারের স্বল্পতার সাথে সাথে এটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈধ বিষয়াদী থেকেও খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিবৃত্ত থাকা হয়। আর এটিও তাকওয়া যে এই বিষয়গুলো থেকে বিরত থেকে কেবল জাগতিক কাজ-কর্মে সময় ব্যয় করলেই চলবে না বরং নামায এবং যিকরে ইলাহীর দিকে পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। পূর্বে যদি নামাযসমূহ জমা করে থাকেন অথবা অনেক সময় যদি কাযা হয়ে গিয়ে থাকে তবে রোযার এ দিনগুলোতে এ দিকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে যেন যিকরে ইলাহী এবং ইবাদত সকল বিষয়াদীর উপর প্রাধান্য লাভ করে।

তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার মহিমা প্রচারের দিকে যেন মনোযোগ থাকে আর আমরা যে আলহামদুলিল্লাহ বলে থাকি এটা কেবল মুখেই যেন উচ্চারণ না করা হয় বরং তিনি আমাদেরকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, ***আলহামদুলিল্লাহ্*** যখন বলবে তখন সর্বদা এ বিষয়টি স্মরণ রাখবে যে, হামদ কেবল রাব্বে জালিলের (প্রতাপশালী খোদার) জন্য নির্ধারিত। এটি যেন মাথায় থাকে যে সকল প্রকার হামদ খোদা তা'লার সত্ত্বার জন্য নির্ধারিত আর তার দিকেই আমরা ফিরে যাবো। আমরা সেই খোদার গুণকির্তন করে থাকি যিনি পথভ্রষ্টদেরকে হেদায়েত দিয়ে থাকেন।

অতএব যদি আমরা পূর্বে সারা বছর খোদার দিকে সেভাবে মনোযোগী না হই যেটা তার প্রাপ্য ছিল তবে এ মাসে আমাদেরকে এ হেদায়েত দিয়েছেন যেন আমরা এ হেদায়েতের মাধ্যমে আগামীর পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করি। আর হামদ-এর কল্যাণ থেকে কল্যাণ মন্ডিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বনকারীও যেন হতে পারি। তিনি (আ.) আমাদেরকে এ দিকটায়ও পথ প্রদর্শন করেছেন যে, হামদ করার সময় এটি সামনে যেন থাকে যে, সমস্ত সম্মান খোদা তা'লার হাতে। অতএব এই রমযানে আমাদের এ

দোয়াও করা দরকার ঐ পূণ্যসমূহ করার সৌভাগ্য যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেন যা তার নৈকট্য দান করবে। আর জগতের সম্মান এবং দম্ভের দিকে আমরা যেন ঝুঁকে না যাই। আল্লাহ্ তা'লার হামদ করার সময় এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, আমাদের নির্ভরতা সর্বদা যেন খোদা তা'লার সত্ত্বার প্রতি হয়, এ জগতের প্রতি যেন না হয়।

এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ্ তালার তসবিহ্‌র দিকে রমযানে মনোযোগ দাও। কেবল ***সুবহানাল্লাহ্*** বলা যথেষ্ট নয় বরং যেভাবে খোদা তা'লার পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে যেন এ দোয়া করা হয় আর ব্যাথাতুর হৃদয়ে এ দোয়া যেন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা জগতের সকল প্রকার অপবিত্রতা (আলায়েস) থেকে যেন পবিত্র রাখেন এবং এ রমযান আমাদের মাঝে যেন প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টিকারী হয়। এরপর বলেছেন, ***তাহলিল*** করো অর্থাৎ নিজ দোয়াসমূহ এ বিশ্বাসের সাথে করো যে, ইবাদতের যোগ্য সত্ত্বা কেবল খোদা তা'লার সত্ত্বা। আমাদেরকে যেকোন ধরনের ক্ষতি থেকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে তিনি হচ্ছেন খোদা তা'লা। আমাদের কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন যদি হয় তবে খোদা তা'লার আশ্রয়ই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। আর মানুষের সর্বদা খোদা তা'লার আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়।

তাই এই প্রকৃত উপাস্যের দিকে সর্বদা ঝুঁকে থাকার প্রচেষ্টা রাখবে। রমযানে রোযার সাথে এ দোয়া করবে যে, খোদা তা'লা! তুমি সর্বদা আমাদেরকে তোমার আশ্রয়ে রেখো। হে খোদা! তুমি রোযার মাধ্যমে কল্যাণ লাভকারীদের জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছ তা থেকে আমাদেরকেও অংশ দান করো, যা সারা জীবন আমাদেরকে কল্যাণমন্ডিত করতে থাকবে। তিনি বলেন যে, তোমাদের এ ***হামদ, তাসবিহ*** এবং ***তাহলিল*** এমন যে ***তাবাত্তুলের*** অবস্থা সৃষ্টি করে দেয় এবং ***তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্*** অর্থ হল, নিজেকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে জগতের সকল প্রকার চাহিদা নিজে থেকে পরিত্যাগ করে নেয়া। খোদা তা'লার সাথে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করে নেয়া।

এরপর বলেছেন, ***ইনকেতা*** (অর্থাৎ জগতকে বাদ দিয়ে খোদা মূখী হওয়া) যেন লাভ হয়। অর্থাৎ জাগতিক সকল রঙ্গ-তামাশা থেকে নিজেকে আলাদা করে নাও এবং খোদা তা'লার ইবাদতের দিকে মনোযোগী হও। যখন অবস্থা এমন হবে সেই উদ্দেশ্য তখন সাধিত হবে, যা খোদা তা'লা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ রোযাদার তাকওয়া অর্জনকারী হবে।

তাই এই রমজান যা বিগত দুই দিন পূর্বে শুরু হয়েছে এবং উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন যাবৎ চলবে, তখনি আমাদেরকে কল্যাণ দান করতে সমর্থ হবে যখন আমরা এ উদ্দেশ্যকে আমাদের সম্মুখে রাখবো এবং এ উদ্দেশ্য এতই বড় যে, এর জন্য অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। নিজ রোযার অধিকার আদায়ের প্রয়োজন আছে এবং নিজ অন্যান্য ইবাদত করারও প্রয়োজন আছে এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার আদায়ের প্রয়োজন আছে, কেননা এ সবকিছুর মিলিত কর্মের নামই তাকওয়া।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি যেভাবে এক বন্ধুর ঘটনা শুনিয়েছি, পূর্ববর্তীগণ ধর্মের উপর আমল করা পরিত্যাগ করেছে, খোদা তা'লার নির্ধারিত অনুসরণ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জরুরী ছিল তা পরিত্যাগ করে বাহ্যিক ও জাগতিক সহজাত প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছে, যে অবস্থায় তাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছিল অথবা রোযার আবশ্যকীয়তা অথবা রোযা রাখার পদ্ধতি তাদের কাছে যে অবস্থায় পৌঁছেছিল তার তত্ত্বকেও তারা পরিত্যাগ করেছে।

অতএব রোযা একটি ইবাদত বিশেষ, যার উদ্দেশ্য হল তাকওয়ায় উন্নতি লাভ করা এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা, অথচ সেটিও শেষ হয়ে গেছে। যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে দেখি তবে এটিও এক ধরনের শিরক যে, বাহ্যত জাগতিক লোকাচারের নামে মেযবানের জন্য খোদা তা'লার আদেশকে ভঙ্গ করা হচ্ছে, বাদ দেয়া হচ্ছে, খোদা তা'লার বিপরীতে যাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়, তার থেকে ধীরে ধীরে খোদা তা'লার সত্ত্বা পিছনে চলে যায় এবং শিরক বিজয় লাভ করে ফেলে।

তাই বলেছেন, তোমাদের পূর্বে যে লোকেরা বিগত হয়েছে তাদের জন্যও রোযা ফরয করা হয়েছিল, কেবল তোমাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয় নি কিন্তু জাগতিক দিক থেকে পুর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা খারাপ হতে থেকেছে এবং তারা খোদা তা'লার আদেশের মুল তত্ত্ব ভুলে গেছে এবং তাদের দ্বারা কেবল লোক দেখানো কর্ম রয়ে গেছে। মুসলমানদেরকে এ উপমার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, সেই সকল মুসলমান যারা রোযার তত্ত্বকে বুঝে এবং ***তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্***-এর দিকে অগ্রসর হয়, রোযার মাঝে হামদ ও যিকিরে মনোযোগ না দেয়, নিজ নামাযের সুরক্ষার পরিবর্তে কেবল নিজ রোযা রাখার জন্য দম্ভ করে, তাদের রোযা এমনি রোযা হবে যেরূপ পূর্ববর্তীদের ছিল। যদি তাকওয়াকে সম্মুখে রাখা না হয় তবে আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হবে যা পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদের হয়েছিল।

অনেক নাম সর্বস্ব বুজুর্গ ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযা রাখে এবং তা প্রকাশ করে দেয় অথচ নফল রোযা তো গোপনে করতে হয়। এধরনের লোকদের কথা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)ও উল্লেখ করেছেন। মেহমান আসলে খাবার আনিয়ে বলবে যে, আপনি খেয়ে নিন আমার কিছু সমস্যা আছে। অথবা খাবারের সময় কারো কাছে চলে যাবে। যখন মেযবান খাতির আত্তি করতে থাকে তখন বলে, না আমি তো পানাহার করতে পারবো না, কিছু বাধ্যবাধকতা আছে, অর্থাৎ লুক্কায়িত শব্দের মাধ্যমে নিজ রোযার প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। (মালফুযাত- ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪১৮-১৯)

তাই এমন রোযাদাররা রমযানেও যারা দীর্ঘ রোযার ফলে, উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে রোযা চলছে, গরমের কারনে, তারা এটিরও প্রকাশ করে দেয়। প্রয়োজনের তুলনায় রোযা দীর্ঘ নয় বরং প্রয়োজনের তুলনায় তাদের প্রকাশটা বেশি মাত্রায়। এরপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য নিজের সেহেরী এবং ইফতারের ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে থাকে যে, সামান্য খাই, খুবই সাধারণ সেহেরী খেয়ে রোযা রাখি, খুব সাধারণ ইফতার করি। যদিও অনেক সময় অবচেতন মনে এমন কথা বলা হয়ে যায় এবং তার মাঝে কোন বানোয়াট কথা থাকে না, কিন্তু অনেকে এমন আছেন যারা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে দেন যেন তাদের রোযার গুরুত্ব এবং কম খাওয়া অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বরং, আমাদের নামসর্বস্ব ওলামাদের মাঝে অনেক লোক এমনও আছেন অর্থাৎ যারা অন্যদের মাঝে ধর্মের কথা তুলে নিজেদের স্বল্প আহারের কথা বলে বেড়ায়।

এমনি এক নাম সর্বস্ব আলেমের ঘটনা আমাদের এক অ-আহমদী বন্ধু শুনিয়েছেন, আলেম ব্যক্তি খুব ভাল বক্তা ছিলেন এবং আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে আরো বেশি ধুন্ধুমার বক্তৃতা করতেন। সেই গায়ের আহমদী বন্ধু উক্ত আলেমের কাছে গেলো। সেই বন্ধু উক্ত আলেমকে খুব মান্যগণ্য করতো এবং তার মুরিদ ছিল। তিনি তাকে খুব খাতির-আত্তি করলেন, নাশতার সময়ও মুরগীর রোষ্ট রাখলেন এবং বলেন যে, এই বড় বক্তা এবং

আলেম ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তিনটি মুরগীর রোষ্ট খেয়ে ফেলল।

এ সকল ওলামা খাদক তো বটেই। মোটকথা এরপর জলসা ছিল এবং জলসায় তার বক্তৃতা ছিল। সেখানে গিয়ে জলসায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য শুরুটা এভাবে করলো, "ধর্মের এই খাদেম (সাইয়্যেদ ছিলেন) আর রাসূল (সা.)-এর নাতির মুখে উম্মতের দু:খে সকাল থেকে এক লোকমাও পড়েনি অথবা একটি দানাও পৌঁছায়নি। সেই অ-আহমদী ব্যক্তি বলেন যে, আমি সামনেই বসা ছিলাম এবং আমার সামনেই এ কথা বলছে অথচ আমার ঘর থেকে তিন প্লেট মুরগি হযম করে এসেছে। সে আলেম তো ঠিক কথাই বলেছে, ভাতের একটি দানাও তিনি খান নি কেবল তিনটি মুরগী খেয়েছেন।

মোটকথা এমনও মুসলমান আছে যাদের ধর্মের জন্য বেদনা এবং ইবাদত ও রোযা, যা এক ইবাদত স্বরূপ তা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না বরং লোক দেখানোর জন্য হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ইবাদতের উদ্দেশ্য তাকওয়া হওয়া উচিত। যদি তোমাদের ইবাদত কেবল বাহ্যিক প্রকাশের জন্য হয়ে থাকে তবে (জেনে রাখো) পূর্ববর্তীদের লোক দেখানো ইবাদত থেকে তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে নি, আর এখনও লাভ হবে না। হ্যাঁ, তোমাদের রোযার উদ্দেশ্য যদি জাগতিক লোকদের প্রভাবিত করা হয় তবে তা নেকী থেকে প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে এবং এটিই তোমাদের পুরষ্কার যা তোমরা লাভ করেছ। খোদার কাছে তো এর কোন প্রতিদান হবে না। যদি আল্লাহ্‌র কাছে কোন নেকীর প্রতিদান আশা কর, রোযার প্রতিদান যদি আশা কর তবে তা তাকওয়া বৈ সম্ভব নয়। আর তাকওয়ার ব্যাপারে কেবল খোদা তা'লাই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যে, কে তাকওয়ার পথের পথিক আর কে নয়।

তাই মু'মিন যখন এই স্তরে চিন্তা করবে এবং স্বীয় রমযান অতিক্রম করার চেষ্টা করবে তবে এ রোযা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হবে, এ রোযা আত্মা পবিত্রকারী হবে, এ রোযা আগামীতে পুণ্য জারি রাখার মাধ্যম হবে, এমন ব্যক্তি ঐ লোকদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে যাদের ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানি অবস্থায় এবং আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল ইমান অধ্যায়: রোযা এবং রমযানে আত্মজিজ্ঞাসা ঈমানি অবস্থায়) খোদা তা'লা এটিও বলে দিয়েছেন, যে রোযা আমার উদ্দেশ্যে রাখা হয় আমি এমন রোযাদারের প্রতিদান হয়ে যাই, (সহীহ্ বুখারী, কিতাব আত-তাওহিদ, অধ্যায়, যিকরুন নাবী হাদীস নং- ৭৫৩৮)।

অর্থাৎ যারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রোযা রাখে তারা এর প্রতিদানে খোদা তা'লাকেই পেয়ে থাকে, জগৎ দিয়ে কী হবে? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এমন দয়ালু যে, যখন দান করেন তখন সীমাহীন দান করেন।

অতএব, এই হল সেই রোযা যা আমাদের প্রত্যেকের রাখার চেষ্টা করা উচিৎ। না ঐ রোযা, যার উদ্দেশ্য রমযানের একটি সংস্কৃতি পালনমাত্র অর্থাৎ রমযানে সমস্ত লোক রোযা রাখে, সেহেরীর জন্য ওঠে, এই প্রথায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রোযা রাখা। কেবল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় বরং তাকওয়া অন্বেষণ আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা আবশ্যক। সেই রোযা হওয়া আবশ্যক যেটি ঢাল স্বরূপ। সেই রোযা হওয়া উচিৎ যে রোযা সকল প্রকার মন্দ থেকে রক্ষা করে এবং সকল প্রকার কল্যাণের পথ উম্মোচন করে। সেই রোযা হওয়া উচিৎ যা কেবল দিনে ক্ষুধার্ত থাকা নয় বরং যেটি যিকরে এলাহীর সাথে সাথে রাতের নফল দ্বারা সুসজ্জিত হবে।

মহানবী (সা.) রমযানের রাতের নফল ইবাদতকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাতে উঠে নামায পড়ে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, তা তাত্ত্যাআ কেয়াস রামযানা মিনাল ঈমান হাদীস নং- ৩৭)

রোযা কেবল ধর্মীয় পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং কল্যাণের পথ উম্মোচনকারী নয় বরং জাগতিক মন্দ বিষয়াবলী থেকে সুরক্ষাকারী এবং জাগতিক কল্যাণের পথ উম্মোচনকারীও বটে। উদাহরণ স্বরূপ রোযার মাধ্যমে এমন একটি উপকারও সাধিত হয় যা বর্তমানে ডাক্তাররাও স্বীকার করে, এক শ্রেণীর বিজ্ঞানিরাও স্বীকার করা শুরু করেছে যে, সারা বছরের মাঝে এক মাস খাবার কন্ট্রোল করা মানব দেহের জন্য কল্যাণকর। এটাও একটি কল্যাণ যা রোযার মাধ্যমে মানব দেহে সাধিত হয়।

অতএব নিয়্যত যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে হয় তবে শারীরিক কল্যাণ নিজে থেকেই সৃষ্টি হয় আর এ ছাড়া আরো অনেক কল্যাণ আছে। আর সেই রোযা যা তাকওয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সেই রমযান যা তাকওয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়া হয়, তা সমাজের সৌন্দর্য্যের কারণও হয়। একে অপরের জন্য কুরবানী করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়। নিজ গরিব ভাইদের প্রয়োজন মিটানোর দিকেও মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং এটি হওয়া আবশ্যক, কেননা মহানবী (সা.)-এর আদর্শ আমাদের সম্মুখে আছে এবং সেখানে আমরা এটিই দেখেছি যে তিনি (সা.) রমযান মাসে ঝড়ো-হাওয়ার ন্যায় সদকা-খায়রাত করতেন।

অতএব প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উক্ত সুন্নতের ওপর আমল করা আবশ্যক। নি:সন্দেহে এটি সমাজের দুশ্চিন্তা দূর করারও কারণ হয়। এক মু'মিনের হৃদয়ে অপর মু'মিনের জন্য, নিজ দুর্বল ও অভাবী ভাইদের জন্য বিনম্রতা এবং ভালবাসার স্পৃহা সৃষ্টির কারণ হয়। একজন আর্থিক ভাবে সচ্ছল ভাই, যে রোযার অধিকার আদায়ের পাশাপাশি নিজ অভাবী ভাইয়ের প্রতি খেয়াল রাখছে এর ফলে অভাবী মু'মিন ভাইয়ের হৃদয়ে সচ্ছল ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

সেই রোযা যা তাকওয়া লাভের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে রাখা হয় সেখানে পরিশ্রমের অভ্যাসও সৃষ্টি হয়। সেহেরী এবং ইফতারিতে স্বল্প আহার এ উদ্দেশ্যে নয় যে, অন্যরা যেন বাহবা দেয়, বরং এ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে যেন দৈহিক রুটি কম খেয়ে আত্মা যেন পবিত্রকরণের প্রতি মনোযোগী হয়। তাই যারা এ ভ্রান্ত ধারণার মাঝে নিপতিত যে, আমরা স্বল্প আহার করে দূর্বল যেন না হয়ে পড়ি তাই সেহেরী এবং ইফতারিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করি, তাদের জন্য শিক্ষা হল নিজেদের খাবার কন্ট্রোল করো।

হুযূর (সা.) অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যেখানে ফিতনা-ফাসাদ হওয়ার ভয় আছে, বিবাদ বাড়ার ভয় আছে, সেখানে রোযাদারদেরকে নসিহত করেছেন যে, তুমি বল ***ইন্নি সায়েম*** অর্থাৎ আমি রোযাদার। এখানে তাকওয়ার পথের দিকে ইশারা করেছেন যে রোযার অধিকার আদায়ের জন্য, তাকওয়া লাভ করার জন্য নিজ আবেগের ওপর কন্ট্রোল থাকা আবশ্যক। তোমরা নিজেদেরকে ঝগড়া থেকে রক্ষা করবে, নিজেদেরকে পরনিন্দা থেকেও রক্ষা করবে, নিজেদেরকে মিথ্যা এবং অন্যায় সাক্ষ্য দেয়া থেকেও রক্ষা করবে যেন রোযার

উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায়।

তাই রোযাদারের মুখ কথনের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা আবশ্যক। এক মাস কথা-বার্তা কন্ট্রোল করা এবং অন্যায় ব্যবহার থেকে বিরত রাখা, তাকওয়া লাভের জন্য এমন অভ্যাস রপ্ত করা আবশ্যক। আর এটি পরবর্তী জীবনে অনেক ধরনের গুনাহ এবং অন্যায় থেকে রক্ষা পাবার কারণ হয়। এক মাসের মন্দ থেকে বিরত থাকার অভাসের ফলে এটি স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়। তাকওয়া অন্বেষণের অভ্যাস সৃষ্টি হয় আর এ অভ্যাস সৃষ্টি হওয়াই রোযা এবং রমযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অন্যথায় বছরে কেবল এক মাস পুন্য কর্ম করা এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা আর এগারো মাস নিজের প্রবৃত্তিগত ইচ্ছা, জাগতিক প্রভাব, মন্দকর্মে নিপতিত হয়ে থাকায় কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় না।

তাই সকলকে এই মাসে আত্মজিজ্ঞাসা করে রোযা এবং রমযানের তত্ত্ব অন্বেষণ করা আবশ্যক। তাকওয়ার পথসমূহ অন্বেষণ করা আবশ্যক। হালাল এবং বৈধ জিনিস খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করার যে স্পৃহা সৃষ্টি হবে তা নিজের মাঝে সর্বতো চারিত্রিক পরিবর্তন সাধন করার মাধ্যম বানানোর চেষ্টা করা আবশ্যক। বান্দার অধিকার আদায়ের দিকে যে মনোযোগ সৃষ্টি হতে হবে, নিজ অভাবী ভাইদের সাহায্য করার প্রতি যে মনোযোগ সৃষ্টি হতে হবে, তা স্থায়ী জীবনব্যবস্থায় রূপান্তর করার প্রতি মনোযোগ এবং চেষ্টা করা আবশ্যক। তাই রোযায় অর্থাৎ রমযান মাসে ইবাদত এবং কুরবানীর যে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তা স্থায়ী করার চেষ্টা প্রয়োজন যেন আমরা মুত্তাকীদের মাঝে অন্তর্ভুক্তগনের দিকে অগ্রসরমান হতে পারি।

এই রমযানে আমাদেরকে নিজেদের সকল যোগ্যতা সহকারে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এটি আমাদের প্রতি খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, রমযানে খোদা তা'লা জান্নাতের দরজা খুলে দেন এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেন। এ মাসে ইবাদতসমূহ, আত্মার পবিত্রতা এবং হুকুকুল ইবাদের আদায়ের মাধ্যমে জান্নাতের ঐ দরজায় আমাদের প্রবেশ করার চেষ্টা করা উচিৎ। অথবা জান্নাতের ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে হবে যে দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে তওবা এবং এস্তেগফার করত: ঝুঁকতে হবে এবং ঐ সৌভাগ্যবানদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে হবে যাদের তওবা কবুল করে আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়ে বেশি খুশি হন যতটা এক মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তান লাভ করার পর আনন্দিত হন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সৌভাগ্য দিন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সেই ভালবাসা লাভকারী হতে পারি। আর আল্লাহ্ তা'লাকে এই রমযানে সেই খুশি পৌঁছাতে পারি যা এক হারিয়ে যাওয়া সন্তানের মা তার সন্তানকে পেয়ে যে আনন্দ লাভ করে সে আনন্দের চেয়ে বেশি হবে। কিন্তু যেভাবে এর পূর্বে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে এ খুশি পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে তাকওয়ার ওপর চলে ঐ ইবাদতসমূহ যেখানে ফরযসমূহ আছে এবং নফলসমূহও আছে এর মানকে বৃদ্ধি করতে হবে। নিজেদের রোজার অধিকার আদায় করতে হবে। হুকুকুল ইবাদ আদায়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা কেবল আর কেবল তারই অনুগ্রহের মাধ্যমে এ সবকিছু এ রমযানে আমাদের অর্জন করার এবং লাভ করার সৌভাগ্য দিন।

নামায জুমুআ আদায়ের পর আমি কয়েকটি জানাযা পড়াবো যেখানে হাযের এবং গায়েব উভয় জানাযা অন্তর্ভুক্ত। জানাযা হাযের যার, তিনি হলে ইরফানা শুকুর সাহেবা, যিনি ডা. মিয়া আব্দুশ শুকুর সাহেবের স্ত্রী। তিনি ৯ জুলাই ২০১৩ তে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৬২ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই হে রাজেউন।

তিনি মোকাররম শেখ জাকাউল্লাহ্ সাহেবের কন্যা ছিলেন যিনি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। মরহুমার বিবাহ জামাতের খুবই পরিচিত এবং নিষ্ঠাবান পরিবারে হয়েছিল। হযরত মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব উজলবী (রা.) তাঁর স্বামীর নানা ছিলেন এবং হযরত মৌলবী দ্বীন সাহেব সাবেক সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেব। এরা উভয়ই মরহুমার শ্বশুর বাড়ীর দিকথেকে আত্মীয় ছিলেন। মৌলভী মোহাম্মদ দ্বীন সাহেবও সাহাবী ছিলেন। তার খালু শশুর হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেবও সাহাবী ছিলেন এবং ইন্দোনেশিয়াতে মোবাল্লেগ হিসেবে ছিলেন। মরহুমা অনেক পুন্যবান, সালেহ এবং নামায-রোযা পালনে একনিষ্ঠ ছিলেন এবং নিজ হালকায় সকলের প্রিয় ছিলেন। নিজ পরিবার এবং সন্তানদের সর্বদা জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা রাখার উপদেশ দিতেন। তিনি মুসীয়া ছিলেন এবং স্বামী ছাড়াও তিনি তিন কন্যা এবং দুই পুত্র ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর এক ছেলে মোকাররম ডা. ওমর আহমদ সাহেবের ২৮ মে ২০১০ সালে লাহোর দারুয যিকিরে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

দ্বিতীয় জানাযা হাযের একটি শিশুর। নাম আযীযা মালিহা আঞ্জুম। মুকাররম নাসির আহমদ আঞ্জুম সাহেবের কন্যা। ওয়ালতুম ইস্টুকায় ৯ জুলাই ২০১৩ সালে দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আযীযা ওয়াকেফাতে নও ছিল।

আর জানাযা গায়েব মোকাররম মৌলানা আব্দুল করিম শারমা সাহেবের। যিনি কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন এবং দাফনও হয়ে গেছে। তিনি ১৯১৮ সালের ২৬ মে কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত শেখ আব্দুর রহিম শারমা সাহেব (রা.) সাহাবী ছিলেন এবং হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। পূর্বে তার নাম ছিল কিশান লাল।

১৯০৪ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার মা হযরত আয়েশা বেগম সাহেবা উম্মুল মু'মেনিন (রা.)-এর প্রতিপালিত ছিলেন এবং তার মা হযরত মূসলেহ মাওউদ (রা.) এবং হযরত মীর্যা শরিফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর সন্তানাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন তাই তাদের দুধমাতাও ছিলেন। তার দাদীকেও আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। মৌলভী আব্দুল করিম শারমা সাহেবের নানা হযরত করম দাদ খান সাহেব (রা.) সাহাবী ছিলেন।

এমনি ভাবে তার নানী মোহতারমা সুলতান বিবি সাহেবাও হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেবের দুধ মাতা ছিলেন। তার দুই ভাতিজা শিকারপুরের শেখ আব্দুর রশিদ শারমার সন্তান ছিলেন, শেখ মোযাফ্ফর এবং শেখ মোবারক। তারা পাকিস্তানে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শারমা সাহেব মৌলিক শিক্ষা কাদিয়ানে লাভ করেন। মৌলভী ফাজেল এবং মেট্রিকের পরে জামেয়া আহমদীয়াতে যোগদান করেন। এর মাঝে তিনি আল ফজল দফতরে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯৩৯ সালের খেলাফত জুবিলিতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) মাওলানা আব্দুল করিম শারমা সাহেবকে ঐ যুবকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন যাদের আহমদীয়াতের পতাকা সংরক্ষণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। ২৬ বছর বয়সে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শুরুতে ২/৩ বছর তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে

চাকুরি করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর নির্দেশে তিনি দ্রুত কাদিয়ান চলে আসেন এবং আফ্রিকার জন্য প্রস্তুতি নেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ৫ মোবাল্লেগের কাফেলার সাথে ইষ্ট আফ্রিকাতে রওয়ানা হন। আর সর্বমোট ২৯ বছর তিনি সেখানে সেবাদান করেছেন। ১৯৬১ সালে যখন ইষ্ট আফ্রিকা তিন ভাগে বিভক্ত হল তখন তিনি ইউগান্ডা, গাম্বিয়াতে মিশনারী ইনচার্য নিবাচিত হন।

এভাবে তিনি আমীর এবং মিশনারী ইনচার্য কেনিয়া হিসেবে দুই দফা সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি ইউ. কে-তে বসবাসরত ছিলেন। ন্যাশনাল মজলিসে আমেলাতে সেক্রেটারী তবলীগ, তরবিয়ত এবং রিশতানাতা হিসেবে তাঁর খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। শত বর্ষ জুবিলীর সময় ইউ. কে. জুবিলি প্লানিং কমিটির মেম্বার ছিলেন। মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফতেরও সদস্য ছিলেন।

তিনি তাঁর নিজের একটি রচনায় লেখেন, (এটি এমন একটি ঘটনা যার মাঝে তার পিতার নিষ্ঠা এবং তার পিতার স্পৃহার প্রতি তার সম্মান প্রদর্শণের চিত্রও পাওয়া যায়।) তিনি বলেন, আমি মাদরাসা আহমদীয়ার চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষে পড়ছিলাম তখন কিছু কারনে মাদরাসা থেকে আমার মন উঠে গেল। আমি চাচ্ছিলাম যে, মাদরাসা ছেড়ে হাই স্কুলে পড়ালেখা করব। সে দিনগুলোতে আমার দুই সহপাঠি হযরত মাওলানা ইবরাহিম বাকাপুরী সাহেবের সন্তান ছিলেন, তারা মাদরাসা ছেড়ে হাইস্কুলে চলে গেলেন।

তাই আমিও উৎসাহী হয়ে উঠলাম। আমি দু'একবার আমার এ ইচ্ছার কথা আমার পিতা সাহেবের কাছেও বললাম। কিন্তু তিনি গুরুত্ব দেন নি। একদিন সকালে আমরা উনুনের পাশে বসে ছিলাম। আমি বাবাকে খুব জোরাজোরি করলাম এবং বললাম, আপনি অন্যান্য ভাইদেরকে তো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন আর আমাকে কেন মাদরাসা আহমদীয়াতে পড়াচ্ছেন?

পিতা সাহেব বললেন, দেখ! আমি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলাম এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাই ছিল যে, তিনি আমাকে ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু আমার পরিতাপ হয় যে, আমি ইসলামের কোন সেবা করতে পারি নি। আমার মনের ইচ্ছা হল, আমার সন্তান ইসলামের সেবা করুক। এই নিয়তে আমি তোমাকে মাদরাসা আহমদীয়াতে ভর্তি করেছিলাম যে, তুমি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে এই যোগ্যতা অর্জন করো যেন ইসলামের সেবা করতে পারো, অথচ তুমি মাদরাসা আহমদীয়াতে পড়তে চাচ্ছ না! এ কথা বলে তিনি মন খারাপ করে দাড়িয়ে থাকলেন এবং কামরায় গিয়ে নামায পড়া শুরু করে দিলেন। তিনি বলেন যে, যে উৎসাহের সাথে তার পিতা সাহেব কথা বলেছেন আর সে মুহূর্তে তার যে অবস্থা হয়েছিল, তা আমার হৃদয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। রাতে ঘুম আসে নি। পিতা সাহেবের জন্য দোয়া করতে থাকি। সকালে আমি সংকল্প করলাম যে, পিতা সাহেবের আকাঙ্খা অনুযায়ী মাদারাস আহমদীয়াতেই পড়ালেখা করবো এবং জীবনও উৎসর্গ করবো। অতএব হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন ওয়াকেফে জীন্দেগীর তাহরিক করলেন তখন আমি হুজুরের সমীপে একটি পত্র লিখে আবেদন করলাম যে, হজুর! অনুগ্রহপূর্বক আমার ওফাকফ্ কবুল করুন।

তাই এভাবে তিনি তার পিতার আকাঙ্খা পূর্ণকরলেন, ধর্মের সেবার স্পৃহাও সৃষ্টি হলো। কয়েকজন মোবাল্লেগের ব্যপারে একবার হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রা.) বলেন যে, আমাদের মোবাল্লেগগণ (তাদের মাঝে তারও নাম ছিল এবং মসজিদে সভা চলছিল) আমাদের এখানে এখন রাবওয়ার আলি-গলিতে চলাচল করছেন, এদেরকে তখন কেউ জিজ্ঞেস করতো না, কেউ বুঝতো না, কিন্তু এ সকল লোকেরাই যারা বিভিন্ন দেশে আজ মোবাল্লেগ হিসেবে কাজ করে বা সেখানে যায় তখন সেখানের প্রেসিডেন্টরা এবং মন্ত্রীরাও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের বড় বড় যে অনুষ্ঠান হয় সেখানে তাদের ডাকা হয় এবং বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়।

এখানে ফেরত আসার পর তার কেনিয়ার এক বন্ধুকে একটি পত্র লিখতে গিয়ে তিনি লেখেন, আমি পশ্চিম আফ্রিকায় প্রায় উনত্রিশ বছর অবস্থান করেছি। আমি সর্বদা নিজেকে সেবার অযোগ্য এবং সংকীর্ণ পেয়েছি। রাত দুটোর সময় আমার ঘুম ভেঙে যেতো আর আমার দুর্বলতা এবং অযোগ্যতাকে চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে পড়তাম এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সাহায্যের জন্য ডাকতাম এবং পরবর্তী দিনের প্রোগ্রাম বানাতাম। তাই সমস্ত মোবাল্লেগদেরকে এই পদ্ধতির দিকে নিজেদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আসতে হবে, সেবার এই প্রেরনা হতে হবে, বেদনা থাকতে হবে, খোদা তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল মোবাল্লেগদের নিষ্ঠার সাথে নিজেদের ওয়াকফ পালন করার এবং সেবা দান করার তৌফিক দান করুন এবং শারমা সাহেবেরও মর্যাদা উন্নীত করুন।

একইভাবে দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ানে যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল তখন তার পিতা এবং ভাই সেখানে ছিলেন, তখন তিনি তার পিতা ও ভাইকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখেন যে, আপনারা সৌভাগ্যবান কেননা সেখানে থাকতে পারছেন, আমারও মন চায়, অবস্থা এমন যে জীবনের নিরাপত্তা নেই যে কে ফেরত আসতে পারবে আর কে না কিন্তু ধর্মের খাতিরে শহীদ হওয়াও একটি অলৌকিক ব্যাপার। হায়! আমি যদি সেখানে থাকতাম তবে এ শাহাদাতের সৌভাগ্য আমি লাভ করতাম, কিন্তু আপনারা সেখানে আছেন তাই আপনারা ভীত হবেন না, কেননা জীবন আসবে-যাবে। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে সেই সৌভাগ্য দান করুন আপনারা যেন কেন্দ্রকে সুরক্ষা করতে পারেন।

এ পত্র লেখা কালে তার মাঝে এমন উদ্দীপ্ত প্রেরণাই ছিল। মোটকথা অতি পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। যতদিন হাটা-চলার ক্ষমতা ছিল ততদিন নিয়মিত আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য চলে আসতেন। যখন হাটা-চলার শক্তি ছিল না তখন হুইল চেয়ারে এসে জুমুআর নামাযে আসার সময় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি মসজিদ ফজলে জুমুআর নামায পড়তেন, আমি জুমুআর উদ্দেশ্যে এখানের মসজিদে আসার জন্য যখন বাইরে বের হতাম (কারে বসার জন্য) তখন সব সময় হুইল চেয়ারে বসে থাকতেন। যতদিন তিনি আসতে পেরেছেন এসেছেন এবং তার চেহারায় অতি বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসার চমক ঝিলিক দিতো। তিনি সাক্ষাত করতেন এবং আসসালামু আলাইকুম বিনিময় হতো।

এছাড়া তার দৌহিত্র (কন্যার পুত্র) উল্লেখ করেন যে, তিনি খেলাফতের সাথে অতি মাত্রায় সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং এর প্রকাশও করতেন। তার এই দৌহিত্র ওয়াকেফে জীন্দেগী এবং মুরুব্বীও বটে। বর্তমানে সুইডেনে কর্মরত। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও তার নানার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করুন।

ভাষান্তর: মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৬ মে, ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের জন্য ক্যালগ্যারীর মেয়রের আগমন

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে হযরত মির্যা মসরূর আহমদের সাক্ষাত এবং সাংবাদ সম্মেলন

২৫ মে ২০১৩, ক্যালগ্যারী শহরের মেয়র নাশীদ নেনশি এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট-ব্যক্তিবর্গ ক্যালগ্যারীর বাইতুন নূর মসজিদে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। এ ছাড়া একটি সাংবাদিক-সম্মেলনে হুযূর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

৩০-মিনিট স্থায়ী এ সাক্ষাৎকারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান এবং মেয়র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যার মধ্যে ছিল, ক্রমবর্ধমান ধর্মীয়-উগ্রতার মোকাবিলার উপায় এবং একটি শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রকৃত ইসলামী-শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় উগ্রতার উত্তর দেয়া সময়ের আশু দাবী।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, সকল পক্ষকে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুপম জীবন-চরিত সম্পর্কে অবহিত করাটা ছিল মুসলমানদের দায়িত্ব। হুযূর বলেন, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং উগ্রতার

মোকাবিলা *"সময়ের ব্যাপার"*, কিন্তু তিনি একটি সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাবাদী।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"ক্যালগ্যারীতে এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি বলেছিলাম, বিশ্বের মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত বাণী উপস্থাপনের সংগ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কখনো ক্লান্ত হবে না। আমি বলেছি, যদি এ প্রজন্ম না হয়, তবে নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলো ইসলামকে সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি শান্তির-ধর্ম হিসেবে দেখতে এবং গ্রহণ করতে শুরু করবে।"

সাক্ষাৎ শেষে মেয়র নেনশি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্যালগ্যারীর প্রশংসা করে বলেন,

"(এটি) এমন একটি সম্প্রদায়, যারা প্রত্যেক দিন, প্রতিনিয়ত আমাদের এ শহরের সেবা করে যাচ্ছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মেয়রকে তাঁর মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,

"উগ্রতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকল শান্তিপ্রিয় মুসলমানের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা আবশ্যক।"

পরবর্তীতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ক্যালগ্যারী পুলিশের প্রতিনিধিদলের সাথে পৃথক এক সৌজন্য-সাক্ষাতে মিলিত হন, যেখানে পুলিশের উপ-প্রধান (ডি.সি.পি.) ট্রেভর ডারু এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যাট পারওয়ারসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডি.সি.পি. বলেন, হযরত মির্যা মসরূর আহমদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ছিল ***"একটি অসাধারণ সম্মানের বিষয়"***, আর সুপরিন্টেন্ডেন্ট পারওয়ার বলেন, ***"আমি কোনো দিন এ সাক্ষাতের কথা ভুলতে পারবো না। আমি আপনার নেতৃত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি।"***

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ জাতীয় সংসদ-সদস্য দেবিন্দর শোরীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন, যার নির্বাচনী এলাকায় বাইতুন নূর মসজিদ অবস্থিত। এম.পি. মহোদয় বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানান এবং আহমদীয়া সম্প্রদায়কে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, সকল শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ করা উচিত।

এর পূর্বে '*সিটিভি*' ও '*ক্যালগ্যারী হেরাল্ড*' সহ আটটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ একটি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন, আর এ সময় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

ক্যালগ্যারী সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, আমি স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ ও ইসলামের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী আরো ব্যাপক পরিসরে প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছি। হুযূর আরো বলেন, যখনই তিনি কোনো দেশ বা অঞ্চল সফর করেন, তখন এটিই তার মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে একথাও স্পষ্ট করেন যে, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে শান্তি, সাম্য ও ঐক্যের বাণী নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তা কোনো সাম্প্রতিক উগ্র-আচরণ বা সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং ১৮৮৯ সালে এই জামাতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আহমদীয়া জামাত এ বাণীই প্রচার করে আসছে।

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষ প্রান্তে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা প্রকৃত-ইসলামের বাণী প্রচার করছি, যা শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাণী।"

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২০ মে, ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

বিশ্ব মুসলিম নেতা-বলেন, 'ধর্ম এবং ধর্মীয়-অধিকার রক্ষার সর্বপ্রথম সনদ হলো পবিত্র কুরআন'

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ভ্যাঙ্কুভারে 'বাইতুর রহমান' মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,

১৮ মে ২০১৩, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে নবনির্মিত 'বাইতুর রহমান' মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিশেষ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত সূধীকে উদ্দেশ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, আহমদীয়া মসজিদকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ 'আপনাদের নেই। কেননা, এই মসজিদ শুধুমাত্র এক-খোদার উপাসনা এবং মানব-সেবার জন্যই নির্মিত হয়েছে।'

নতুন মসজিদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি দাবী করছি এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই, এই মসজিদ আহমদী-অআহমদী, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ভালবাসা, সৌহার্দ্য, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সেতুবন্ধন প্রমাণিত হবে। আমাদের মসজিদের দ্বার সর্বদা সব-ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, কেননা-এই মসজিদ খোদার আশীর্বাদ, করুণা, ভালবাসা এবং মানবজাতির জন্য সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যম।"

খলীফা এরপর জিহাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, পূর্বে মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক-যুদ্ধের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যাতে এটি সব ধর্মের এবং সকল উপাসনালয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ধর্ম এবং ধর্মীয়-অধিকার রক্ষার সর্বপ্রথম সনদ হলো পবিত্র কুরআন', আর একে সরাসরি মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অন্য কথায়, যখনই একটি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়, তখনই ধর্মীয়-স্বাধীনতার একটি নতুন-অধ্যায় সূচিত হয়।"

বিশ্বনেতা তাঁর এই বক্তব্যে সম্প্রতি একটি 'ধর্মীয় স্বাধীনতা বিভাগ' খোলার জন্য কানাডার সরকারকে অভিনন্দন জানান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমার মতে, কানাডার সরকার 'ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিদপ্তর' চালু করার জন্য প্রশংসা ও অভিনন্দনের দাবী রাখে। আমরা কানাডা সরকারের এই মহতি উদ্যোগের পক্ষে পূর্ণ-সমর্থন ব্যক্ত করছি। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয়-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করবো।"

খলীফার মূল বক্তব্যের পূর্বে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

কেরি-লিন ফিন্ডলে, সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নতুন মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করে শোনান।

কানাডার ধর্মীয়-স্বাধীনতা দফতরের বিশেষ দূত ড. অ্যান্ড্রু বেনেট বলেন, "আহমদীয়া মুসলিম জামাতের 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই বাণী এবং এর প্রতি নিষ্ঠা" দেখে আমি বিস্মিত।

ডেল্টা শহরের মেয়র লুইস জ্যাকসন বলেন, **"মসজিদটি রাতারাতি একটি মাইল ফলকে পরিণত হয়েছে"**। তিনি বলেন, **"হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে এই শহরে পাওয়া আমাদের জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয়"**।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সিনেটর মোবিনা জাফর কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা জাস্টিন ক্রুডুর একটি বাণী পাঠ করেন, যাতে তিনি মসজিদটিকে ব্রিটিশ-কলম্বিয়ার জন্য ও সর্বোপরি কানাডার সৌন্দর্যে **"একটি কাঙ্খিত সংযোজন"** বলে অভিহিত করেছেন।

সংসদ সদস্য যুডি সগরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে বহু সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নির্দেশ করে **"আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতি আমরা কি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রাখি"**। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাত **"সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি উদাহরণ"**।

সংসদ সদস্য জিনি সিমস বলেন, যদি সকলে আহমদীদের মূলমন্ত্র **'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'**-র বিশ্বাস ধারণ করে, তবে **"পৃথিবী একটি উত্তম স্থানে পরিণত হবে"**।

সংসদ সদস্য জিম কেরিজিয়ানিস বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে নিপীড়ন-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে, তা **"ভুলে যাওয়ার নয়"**। তিনি বলেন, **'সকল মানুষের ধর্মীয়-স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সকল পক্ষের একসাথে কাজ করা আবশ্যক'**।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য রব নরিস বলেন, **"অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য ও সম্মানিতবোধ করছি"**। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত **"আমাদের গোটা দেশকে সমৃদ্ধ করেছে"**।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য মানমিট ভুলার বলেন, হযরত মির্যা মসরূর আহমদের সাথে সাক্ষাৎকার তার জীবনে একটি "স্মরণীয় মুহূর্ত" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আহমদীয়া সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে প্রদেয় এক বার্তায় তিনি বলেন, **"আমরা আপনাদের সাথে আছি, যেভাবে আপনারা আমাদের সাথে আছেন"**।

ভন শহরের কাউন্সিলর মারলিন ইফ্রাট বলেন, আহমদী মুসলমানদেরকে নিজেদের মাঝে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা **"অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী"**। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত "সমাজের সেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত"।

মিসিসাগা শহরের কাউন্সিলর রন স্টার ঘোষণা করেন, তার নগর-পরিষদ ১৮ মে'কে **"আহমদীয়া দিবস"** হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আহমদী মসজিদের **"শান্তি, সম্প্রীতি আর একসাথে কাজ করার মাধ্যমে বিশ্বকে উত্তম-স্থানে পরিণত করার সুনাম রয়েছে।"**

মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার পূর্বে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ৩০ মিনিটের একটি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের মধ্যে 'সিবিসি', 'সিটিভি', 'গ্লোবাল টিভি' সহ 'দি প্রোভিন্স' ও 'ভ্যাঙ্কুভার সান' সংবাদপত্র ছিল উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৩১ আগষ্ট, ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

এক বছরে ৫,৪০,০০০-এরও অধিক লোকের আহমদীয়াত তথা সত্য-ইসলাম গ্রহণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের ৪৭তম বার্ষিক জলসা কর্মসূচী

যুক্তরাজ্যের ৪৭তম বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত এক ঈমান-উদ্দীপক বক্তৃতায়, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ঘোষণা করেন যে, গত বছরে ৫,৪০,০০০-এরও অধিক মানুষ এই জামাতে যোগদান করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠের সময় হুযূর (আই.) এই সংখ্যার ঘোষণা দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরও জানান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখন পৃথিবীর ২০৪টি দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। গত বছর এ তালিকায় কোষ্টারিকা ও মন্টেনিগ্রোও যুক্ত হয়েছে।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, গত বছর আহমদীয়া মুসলিম জামাত ৩৯৪টি নতুন

মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করে। এগুলোর মধ্যে কানাডা, জার্মানী ও স্পেনের নবনির্মিত মসজিদগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো হযরত মির্যা মসরূর আহমদ স্বয়ং উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ১২১টি নতুন মিশন-হাউজ বা কেন্দ্রও লাভ করে।

ইসলাম সেবার একটি পন্থা হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বর্তমানে ৭১টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেছে। একই সাথে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচারের অংশ হিসেবে অসংখ্য বই-পুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

মানবতার সেবার অংশ হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর দাতব্য-কার্যক্রমের ক্ষেত্রকে আরোও সম্প্রসারিত করেছে। বিশেষ করে হুযূর (আই.) 'জীবন রক্ষায় পানি' (Water for Life) প্রকল্পের উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে আফ্রিকার বিভিন্ন প্রত্যন্ত-অঞ্চলে শত-সহস্র বঞ্চিত-মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয়-জল সরবরাহ করা হয়েছে।

দিনের প্রথম ভাগে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সরাসরি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র (মহিলা অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। হুযূর বলেন, সকল পেশা ও ধর্মের মানুষ পৃথিবীর সকল প্রান্ত হতে কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে গ্রহণ করতে এসেছিল। এভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মানব জাতিকে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে একতাবদ্ধ করে চলেছে।

হুযূর বলেন, সমাজের সকল স্তরে ন্যায়বিচার ও সাম্যের কোন বিকল্প নেই ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরও বলেন,

"এটি আমার পর্যবেক্ষণ,-আত্ম-অহংকার ও স্বার্থপরতাই বিবাহ-বিচ্ছেদের মূল কারণ। সত্য কথা হচ্ছে, যদি একজন স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে সততা ও সমতার ভিত্তিতে দেখে, তবে কোনো বিরোধই থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই সকল স্তরে সততা ও ন্যায়বিচারের ওউপর নির্ভর করে যেকোন সমাজের শান্তি ও সৌন্দর্য।"

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৩০ আগষ্ট, ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

ইসলামী সম্মেলনে হাজারো লোকের মিলনমেলা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৩০,০০০ এরও অধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

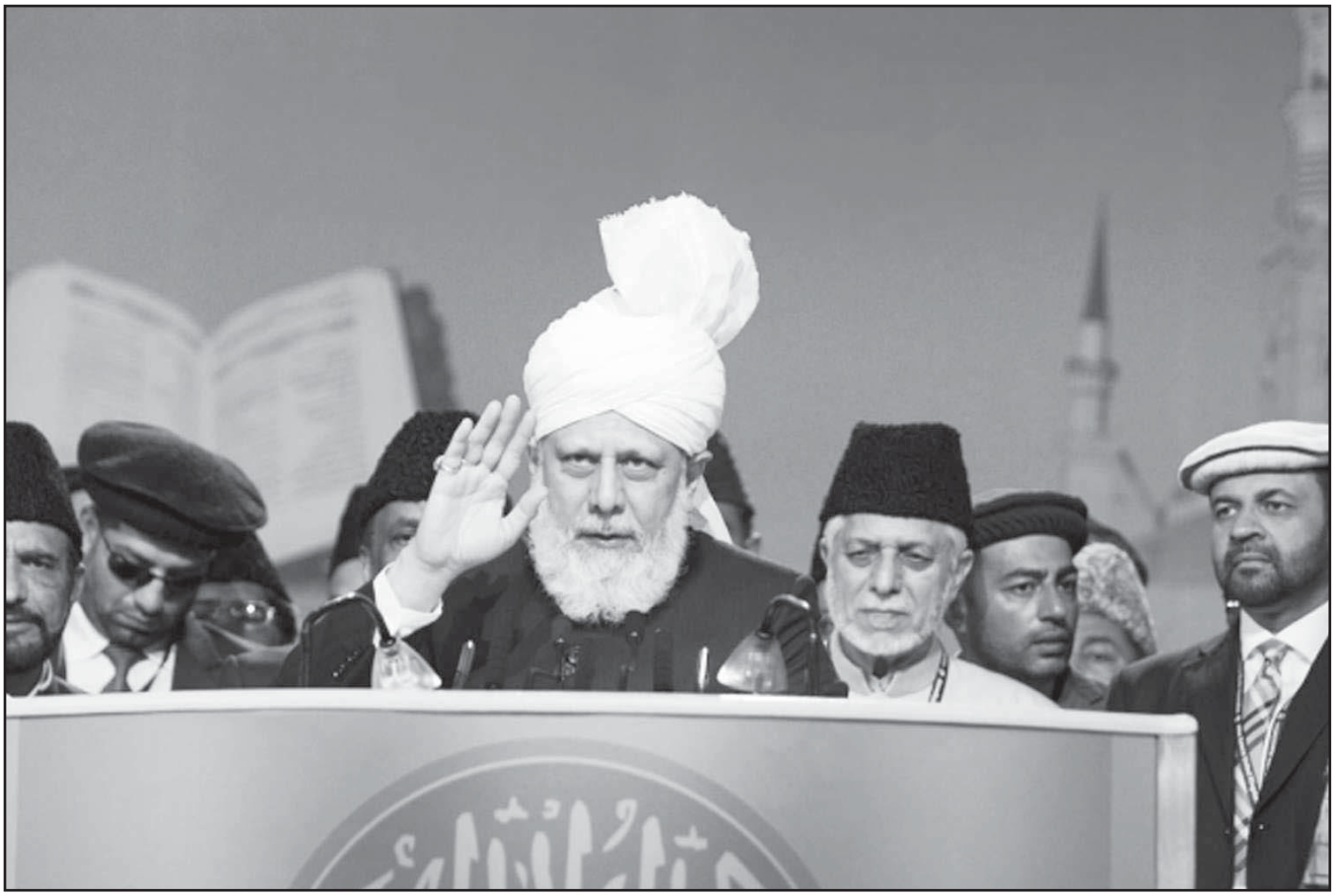

যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪৭তম বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) অদ্য (৩০ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ) যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ 'হাদীকাতুল মাহদী' নামক স্থানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রায় ৩০,০০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে এবং তা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এ বছর যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শতবার্ষিকী জুবিলী উদ্‌যাপন করছে এবং এই সালানা জলসা শতবর্ষীয় অনুষ্ঠানমালার সবচাইতে বড় অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রথমদিন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে দু'বার বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমে তিনি জুমুআ'র খুতবা প্রদান করেন

এবং পরবর্তীতে জলসা সালানার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এছাড়াও সালানা জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অংশ হিসেবে তিনি পতাকা উত্তোলন করেন, একই সাথে যুক্তরাজ্যের পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক'ও উত্তোলন করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় জলসা উদ্‌যাপনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি আধ্যাত্মিক-অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় সকল অংশগ্রহণকারীর মাঝে ইতিবাচক নৈতিক-পরিবর্তন আনয়ন করা।

অপরাহ্নের অধিবেশনে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এ যুগে আবির্ভূত হয়ে কীভাবে বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের সত্যিকার শান্তিময়-শিক্ষার সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন– তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তার অনুসারীদেরকে বলেন, শুধুমাত্র কথায় নয় বরং কর্মের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ আবশ্যক।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, মানবতার সেবা করা হচ্ছে, ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের একটি অন্যতম অংশ। হুযূর বলেন, নিজের অধিকার আদায় করার আগে অন্যের অধিকার প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তিনি (আই.) আরো বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-ও এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয় যেন মানবতার প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকে।

যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"এ বছর আমরা যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন করছি। তবে, এই জুবিলী অনুষ্ঠান তখনই সত্যিকারের আনন্দ বয়ে আনবে, যদি এই শতবর্ষ আমাদের মাঝে এক মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব নিয়ে আসতে পারে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বিশ্ব শান্তির জন্য দোয়ার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ সকল সংঘর্ষের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। তিনি সকল পক্ষকে ন্যায়বিচার এবং একে অন্যের অধিকার প্রদানের প্রতি আহবান জানান।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের হাজারো আহমদী মুসলমান এমটিএ'র মাধ্যমে জলসায় অংশ নেন। নিরব-দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। জলসায় অংশগ্রহণকারী অনেকেই হাদীকাতুল মাহদীর সাময়ীক-তাঁবুতে অবস্থান করেন, কেউ আবার কাছাকাছি হোটেলে অবস্থান করেন, আর অন্যরা প্রতিদিন যাতায়াত করে অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন।

এ বছরের বার্ষিক জলসায় বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার একটিতে স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয় এবং এর পাশাপাশি অপর একটি প্রদর্শনীতে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ১০০ বছরের ইতিহাসের প্রামাণ্য-চিত্র তুলে ধরা হয়। অন্য একটি প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেভাবে নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এর বিপরীতে আহমদীয়া জামাতের ইতিবাচক এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়।

জলসা সালানার সম্পূর্ণ-অনুষ্ঠান এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে সরাসারি সম্পচারিত হয়, যা 'স্কাই ৭৮৭' এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে দেখা যায়। এছাড়া জলসার অধিবেশনসমুহ অনলাইনে MTA.tv 'র মাধ্যমেও সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

রূপক-বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(৭ম কিস্তি)

তৃতীয়তঃ 'দাজ্জালী ফেতনা' বলতেও ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসকেই বুঝায়। হাদীসে বলা হয়েছে যে, সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালী ফেতনা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে (মুসলিম, আবু দাউদ)। সূরা কাহাফের প্রথম রুকুতে বলা হয়েছেঃ "পবিত্র কুরআন ঐ সকল লোকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে, যারা বলে আল্লাহ্‌র একটি পুত্র সন্তান রয়েছে"। সুতরাং দাজ্জাল বলতে ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্ট-ধর্মের অনুসারীদেরকেই বুঝায়, যারা যীশুকে খোদার পুত্র বলে উপাসনা করছে। হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) প্রমাণ করেছেন যে, যীশুখ্রিষ্ট স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন এবং সেই কারণে তিনি কখনোই খোদার পুত্র বা খোদা হতে পারেন না। পাশ্চাত্য জগত যেদিন এই বিষয়টির গুরুত্ব মনে-প্রাণে বুঝতে পারবে, সেদিন তারা ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করে একত্ববাদের আহ্বানে সাড়া দিবে; বিশ্বব্যাপী সেই প্রচেষ্টা ও প্রচারই করে যাচ্ছে আহমদীয়া জামাত।

চতুর্থতঃ পৃথিবীব্যাপী বিরাজমান পাপ-পঙ্কিলতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রায়শ্চিত্ববাদের মাধ্যমে পাপ হতে পরিত্রাণের সহজ সরল ব্যাখ্যা। কারণ 'সকল পাপের জন্য যীশুখ্রিষ্ট রক্তদান করেছেন'--- এটাই প্রায়শ্চিত্ববাদের মূলকথা। সামাজিক ও নৈতিক-ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা,যৌন অনাচার, জুয়াখেলা, মদ্যপান, নেশা-জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার, ইত্যাদি সমস্যা ও সংকট বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। তাই মানব জাতিকে নৈতিক অধ:পতন এবং মহাধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধারকল্পে যথাসময়ে আগত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, প্রায়শ্চিত্ববাদ সম্পর্ণরূপে কল্পিত-ধারণা মাত্র (কেননা যীশুখৃষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই-সুতরাং প্রায়শ্চিত্ব প্রদানের প্রশ্নই উঠে না) এবং একের পাপের বোঝা অন্যের পক্ষে বহন করা যেমন অযৌক্তিক, তেমনিই অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন (সূরা আল আনআম:১৬৫)। যেদিন ত্রিত্ববাদী এবং প্রায়শ্চিত্ববাদীগণ এ কথা বুঝতে পারবেন যে, প্রত্যেকটি পাপ ও অপকর্মের জন্য মহা শক্তিশালী খোদা তা'লার সম্মুখে বিচার অনুষ্ঠিত হবে ও শাস্তি পেতে হবে এবং যীশুখ্রিষ্ট কারো পাপের বোঝা বহন করবেন না, সেই দিন হতে পৃথিবীকে সত্যিকার অর্থে পাপ ও কলুষমুক্ত করা সহজতর হবে। শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রচেষ্টাই করে চলেছে আহমদীয়াত।

পঞ্চমতঃ বিবাদকারীদের 'দারগোড়া' এবং 'পানিতে লবণ গলে যাওয়ার ন্যায় দাজ্জালের নিশ্চিহ্ন হওয়া' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর তা'বির বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের সংগে যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা মোকাবেলা করছে এবং খ্রিষ্টানদের কেন্দ্রস্থলগুলিতে গিয়ে ইসলামের তৌহীদের বাণী প্রচার করছে। কারণ নীতিগতভাবে এবং চুড়ান্ত বিশ্লেষণে যে-ব্যক্তি দলিল-প্রমাণে পরাজিত হয়, সে-ই ধ্বংস হয় এবং যে ব্যক্তি দলিল প্রমাণে জীবিত, সে-ই জীবিত থাকে (সূরা আনফাল:৪৩)। ফলত: আহমদীয়া জামা'তের প্রচার-তৎপরতার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ত্রিত্ববাদ এবং দাজ্জালিয়াত দ্রবীভূত হচ্ছে এবং সেদিন দুরে নয়, যখন খ্রিষ্টানগণ যীশুর উপাসনা পরিত্যাগ করে এক-খোদার উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

ষষ্ঠতঃ হাদীসে দাজ্জালের বাহনের (গাধার) যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে (৭০ গজ লম্বা কান, আগুন ও পানি দ্বারা চলা ইত্যাদি) তারও সঠিক ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা বাহ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহে বর্ণিত আকৃতি ও গুণাগুণ বিশিষ্ট গাধার জন্ম হওয়া যেমন অবাস্তব, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত বিষয়াবলীর এরূপ আক্ষরিক অর্থ করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ 'ধোপার গাধা' এবং লেখাপড়ায় কাঁচা ছেলেকে 'গাধা' বলার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা সহজেই বোধগম্য।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত 'গাধা' বলতে বর্তমান যামানায় যন্ত্রচালিত যান-বাহন বিশেষত: রেলগাড়ী, স্টীমার, উড়োজাহাজ, ইত্যাদিকেই বুঝানো হয়েছে। এই সকল যানবাহনের মাধ্যমে বিশেষভাবে খৃষ্টানজাতি সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের পাশাপাশি ত্রিত্ববাদীতার প্রচারও ব্যাপকভাবে করে চলেছে (অবশ্য এই সকল যন্ত্রচালিত যানবাহনের নিজস্ব কোন দোষ নেই, ব্যবহারকারীর ওপর ভাল-মন্দ নির্ভর করছে)। দাজ্জালের বাহন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হওয়ার জন্য যারা অপেক্ষা করছেন, তাদের মনোবাঞ্ছা বাস্তবে কখনোই পূর্ণ হবে না। হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখানুযায়ী সংশ্লিষ্ট হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগেই পূর্ণ হয়েছে।

দাজ্জালের গাধা এবং দাজ্জালের আবির্ভাবও যেমন হয়েছে, তেমনিভাবে দাজ্জালের বধ-কারীরও আবির্ভাব হওয়া অবধারিত ছিল বলে তিনিও যথা সময়ে আগমণ করেছেন।

সপ্তমতঃ হাদীসে আরো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, দাজ্জাল কাবা-গৃহের চতুর্দিক দিয়া তাওয়াফ করবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহও কাবাগৃহের তাওয়াফ করবেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে (মুসলিম শরীফ)। 'কাবাগৃহের তাওয়াফ' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

একদিকে দাজ্জাল ইসলামের চরম বিরোধীতা করছে এবং ছলে-বলে-কৌশলে ইসলামের ধ্বংস-সাধনের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সত্যিকার অর্থে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও আদর্শের অপরাজেয়-শক্তি নিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর প্রচারক-দলও দিকে দিকে প্রচার-তৎপরতা বৃদ্ধি করে চলেছে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নীরবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে বিশ্বব্যাপী প্রচার ও পূণ:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

(গ) 'শুকর-ধ্বংস সংক্রান্ত রূপক বর্ণনার তাৎপর্যঃ

বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের অন্যতম প্রধান কার্য হিসেবে 'শুকর নিধন' (ইয়াকতুলুল খিনজির) করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। স্পষ্টত: বাহ্যিকভাবে শুকর বা শুয়র বধ করা কোন মহাপুরুষের কাজ হতে পারে না এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর নয়।

ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষাতে 'শুকর নিধন' দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট-প্রকৃতির লোকদের নিধন করা বা এরূপ লোকদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করা বুঝায় (কিতাবুল ইসারাত, ২য় খন্ড, পৃ:৩০৩)। কুরআন করীমে অভিশাপ এবং গজব-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্য হতে শুকর ও বানর হওয়ার উল্লেখ রয়েছে (সূরা মায়েদা: ৬৯)।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মীর্যা সাহেবের সঙ্গে 'মোবাহেলা' বা প্রার্থনা-যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে কতিপয় দুষ্ট-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির অলৌকিক মৃত্যু ঘটেছে। পাঞ্জাবের আর্য সমাজী পন্ডিত লেখরাম, পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথাম, আমেরিকার ডক্টর আলেকজান্ডার ডুই, ইত্যাদি দুষ্টলোক হযরত মীর্যা সাহেবের (আ.) সঙ্গে মোবাহেলার ফলশ্রুতিতে ঐশী-নিদর্শন রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

এছাড়া সাধারণভাবে মানব-প্রকৃতি হতে সকল প্রকার পশুত্বকে হত্যা করে নৈতিক (বা-আখলাক) এবং আধ্যাত্মিক (বা-খোদা) আদর্শের পূর্ণ:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহমদীয়া আন্দোলনের বাস্তব-ভিত্তিক সুসংগঠিত প্রচেষ্টাসমূহ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করে চলেছে।

অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কিত কার্যাবলীঃ

হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের একটি বিশেষ কাজ হিসেবে বলা হয়েছে যে, সেই সময় ধন-দৌলতের প্রাচুর্য হবে। সহী হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ মাল-সম্পদের দিকে আহ্বান জানাবেন, কিন্তু কেহ তা গ্রহণ করবে না (লা ইয়াদউনা ইলাল মালে হাত্তা লা ইউকবালুহু আহাদুম)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সম্পদ পাওয়া এবং বিলি বন্টনের সত্যিকার তাৎপর্য কি, তা ভালভাবে বুঝা প্রয়োজন। শুধু বাহ্যিকভাবে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টির জন্য কোন ঐশী-প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন হয় না। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসাবে অবশ্যই ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছে। তবে সেই প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আধ্যাত্মিক-জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার অন্যতম উপাদান হিসেবে---- একমাত্র উপাদান বা লক্ষ্য হিসেবে নয়। তাই পবিত্র কুরআনে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য দোওয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে (সূরা বাকারা:২৩২)।

অনেকে বলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) সবাইকে ডাক দিবেন এবং 'গন্ডুষ ভরিয়া' প্রচুর টাকা পয়সা দান-খয়রাত করবেন। চুড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহা সহজেই অনুমেয় হয় যে, বাহ্যিক এরূপ প্রাচুর্য এবং দান-খয়রাতের দ্বারা পৃথিবীর কোন কল্যাণ হতে পারে না (অবশ্য অভাবী এবং অক্ষমদেরকে দান-খয়রাত করার কথা আলাদা এবং ব্যক্তি ও সাংগঠনিক পর্যায়ে তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন)। যদি সাধারণ ধারণা মতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সত্য সত্যই গন্ডুষ ভরিয়া অর্থ-সম্পদ দান করতেন, তাহলে পৃথিবীতে এক মহা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "যদি আল্লাহ রিযিকের প্রাচুর্য বিস্তৃত করে দিতেন, তাহলে পৃথিবীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হতো"। (সূরা শুরা:২৮)

সুতরাং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য বলতে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও উৎকর্ষতা-জনিত সম্পদের প্রাচুর্যকে বুঝানো হয়েছে; যার দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বিশ্ববাসীকে ইসলামের ঝান্ডাতলে এক অখন্ড-সমাজ কায়েম করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম অবস্থায় খুব অল্প লোকই তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। অবশ্য কালক্রমে তাঁর আহ্বান দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে আধ্যাত্মিক সম্পদের বন্টন-কার্য সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

বাহ্যিকভাবেও বিভিন্ন সময়ে হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) তাঁর চরম বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করত: বিভিন্ন অংকের অর্থ-সম্পদ দান করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এভাবেও উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো। 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক গ্রন্থে (১৮৮২-৮৪ খৃ:) তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তকে প্রদত্ত যুক্তি-প্রমাণ সমূহের এক পঞ্চমাংশ খন্ডন করতে পারেন, তবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন অথবা সমমূল্যের পৈত্রিক সম্পত্তির দখল ছেড়ে দিবেন।

অনুরূপভাবে 'কিতাবুল বারিয়া' নামক গ্রন্থে (১৯০৩ খৃ:) তিনি এই মর্মে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে চলে যাওয়া এবং পুণরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় তার ঐশী প্রদত্ত জ্ঞানের সমকক্ষতার জন্য সমকালীন বিশ্ববাসীর প্রতি হাজার হাজার টাকার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে কোন ব্যক্তি পুরস্কারসমূহ গ্রহণ করতে সাহস পান নাই। এভাবেও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী- 'তিনি মালের প্রতি আহ্বান জানাবেন, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না' পুর্ণতা লাভ করেছে।

(ঘ) যুদ্ধ রহিতকরণ মূলক কার্যাবলীর তাৎপর্যঃ

নীতিগতভাবে ইসলাম মানে কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম এবং ইসলামী শিক্ষা হলো:'লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ অবৈধ (সুরা বাকারা: ২৫৭)। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ 'বিশ্ব-জগতের কল্যাণ' বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা

হয়েছে (সুরা আম্বিয়া: ১০৫)। ইসলামে শুধু আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (সুরা হাজ্জ: ৪০)।

ইসলামের আবির্ভাবযুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম বিরুদ্ধবাদীগণ বারবার মুসলমানদের ওপর আক্রমন চালিয়েছে এবং তার ফলে মুসলমানগণ অনেকগুলো যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমান কালে ইসলামে দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক-অভ্যুত্থানের যুগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-কে এইজন্য 'আহমদ' (সুরা সাফ: ৭) এবং মসীলে ঈসা (সুরা নুর: ৫৬ এবং সুরা ফাতহে: ৩০) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাধ্যমে ইসলামের 'জামালী' (গুণগত ও সৌন্দর্যমুলক) বিকাশ সংগঠিত হবে এবং যুক্তি, জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের আলোকে ইসলাম মহা-বিজয় লাভ করবে (সুরা সাফ: ১০)।

বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.)-এর অন্যতম প্রধান কাজ হবে যুদ্ধ রহিত করা (ইয়াজাউল হারব)। কোন কোন বর্ণনায় 'ইয়াজাউল জিযইয়া' (যুদ্ধকর বা জিযইয়া উঠাইয়া দিবেন) বলে উল্লেখ রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্ তা'লা ওহীর দ্বারা মসীহ মাওউদ (আ.)-কে সংবাদ দিবেন যে, আমি এমন কিছু লোক উত্থিত করেছি, যাদের সঙ্গে কারও যুদ্ধ করার ক্ষমতা নাই; সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ কর"। (মুসলিম ও আবুদাউদ)

উপরোক্ত বিষয়গুলো হতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে অস্ত্রের যুদ্ধ করার দায়িত্ব দেয়া হয় নাই। 'যুদ্ধ নয় শান্তি' এই নীতির আলোকে যুক্তি জ্ঞান এবং ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করত:বিশ্ব বিজয়ের দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে তাঁর ওপরে। সুতরাং 'খুনী মাহদী' বা যুদ্ধবাজ মাহদীর আগমনের জন্য যারা অপেক্ষমান, তাদের সেই আশা যেমন নীতিগতভাবে ভিত্তিহীন, তেমনি অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের অবসানকল্পে এবং ইয়াজুজ মাজুজের ক্রমবর্ধমান তান্ডবলীলা হতে মানবজাতিকে রক্ষার্থে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছন, তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১- বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি নীতিগতভাবে ইসলাম সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের লোকদের সকল প্রকার বিরূপ-ধারণার অবসান করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী সত্যিকার ইসলামী-শিক্ষার প্রচার নিশ্চিত করণের জন্য যথোপযুক্ত মিশনারী-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহতাআলার অনুগ্রহে বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচার কেন্দ্র সমূহ যুদ্ধংদেহী ইসলাম (এক হাতে কুরআন অন্য হাতে তলোয়ার) সম্পর্কিত ভ্রান্ত-ধারণা দূরীকরণের কার্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২- পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শের আলোকে কিভাবে বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধ-জনিত সমস্যবলীর সমাধান করা সম্ভব, তার যুক্তিপুর্ণ এবং সময়োপযোগী রূপরেখা তিনি এবং তাঁর খলিফাগণ বিভিন্ন পুস্তকাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমত: এই সকল নীতি প্রয়োগ করার জন্য ঐশী মনোনীত আধ্যাত্মিক সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আহমদীয়া জামাত এই উদ্দেশ্যে শান্তিপুর্ণভাবে প্রচার কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মুল কারণ সমূহ দূর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী কোন জাতি অপর জাতিকে উপহাস না করা এবং কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষবশত: অন্যায় করতে প্ররোচিত না হওয়া- এই দুটি মৌলিক-বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য খুবই জরুরী (সূরা হুজুরাত: ১২ ও সূরা মায়েদা: ৯)।

৩- বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধের সমস্যাবলী হতে রক্ষা পেতে হলে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী বিবদমান জাতিগুলোর মধ্যে মীমাংসা এবং সমঝোতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ন্যায়-বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে। সুরা হুজুরাতে এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত কার্যকর এবং অতুলনীয় পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে, যা বর্তমানকালে অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: "বিশ্বব্যাপী দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা সম্মিলিতভাবে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে; যদি এরপরও একদল অপর দলকে আক্রমণ করে, তাহলে তোমরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ আক্রমণকারী দলটি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আত্মসমর্পণ না করে। অত:পর ন্যায়-মীমাংসা কর এবং সুবিচার কর। আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদিগকে পসন্দ করেন।" (সুরা হুজুরাত:১০)।

(চলবে)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর দপ্তর থেকে বিগত ১৭/০৭/২০১৩ তারিখের ০৪৭৬৩নং পত্রের মাধ্যমে ওয়াকফে জাদীদ সিলসিলাহ-তে প্রত্যেক জামা'তের শতকরা ১০০ ভাগ সদস্যকে শামিল করার তাগিদ দিয়েছেন।

২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জামা'তকে ২০,০০০ সদস্যকে এ সিলসিলাহ-তে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। বিগত ১৬ই আগষ্ট, ২০১৩ তারিখের খুতবায় হুযূর আকদাস (আই.) প্রতিটি নও মোবাঈন সদস্যকে এমনকি ০১ (এক) পয়সা চাঁদা দিয়ে হলেও এ পবিত্র তাহরীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

এমতাবস্থায়, হুযূর আকদাস (আই.) এর প্রত্যাশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী সিলসিলাহ/ মোয়াল্লেম ও সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ-কে স্ব-স্ব জামা'তের নবজাতক শিশু থেকে অশাতীপর বৃদ্ধ/বৃদ্ধা সকলকেই এই মালী কুরবানীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য এবং আগামী ২০শে ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীগণের তালিকা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো, যাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) এর বরাবরে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়। প্রয়োজনে SMS এর মাধ্যমে নিম্নের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
বাংলাদেশ
মোবাইল নং- ০১৭১৪০৮৫০৭০

বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস

খন্দকার আজমল হক

(৩য় কিস্তি)

৬। বাইবেল প্রায়শ্চিত্তবাদ স্বীকার করে না।

খ্রিষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের প্রতি প্রেমের কারণে যীশু তাদের পাপ নিজ স্কন্ধে বহন করে স্বেচ্ছায় ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন, যাকে প্রায়শ্চিত্তবাদ বলা হয়। কিন্তু ত্রিত্ববাদের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাসও তাদের ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। বরং বাইবেল এর বিপরিত কথাই বলে।

বাইবেলে বলা হয়েছে, "যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে। পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার ওপর বর্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার ওপর বর্তিবে। অধিকন্তু দুষ্টলোক যদি আপনার কৃত সমস্ত পাপ হইতে ফিরে ও আমার বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্মাচারণ করে, তবে সে অবশ্য বাঁচিবে, সে মরিবে না।" (যিহিস্কেল, ১৮, ২০-২১) এখানে যেমন যার পাপ তাকেই বহন করার কথা বলা হয়েছে, তেমনই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবাদ নয়, বরং পাপীকেই নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা তা হতে রক্ষা পেতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলে এরূপ বিধান বর্তমান থাকতে যীশু কিভাবে অন্যের পাপ বহন করবার জন্য স্বেচ্ছায় অভিশপ্ত-মৃত্যু বরণ করতে পারেন?

প্রায়শ্চিত্তবাদকে স্বীকার করার পূর্বে পুরাতন নিয়মের উপরোল্লিখিত বিধানকে লোপ করতে হবে। কিন্তু যীশু নিজেই বলেছেন, মনে করিও না যে আমি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার একমাত্রা, কি এক বিন্দুও লোপ হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" (মথি- ৫: ১৭-১৮)

এ কারণেই যীশু নিজেই শাস্ত্রের উল্লেখ করে দিয়াবল ও যিহুদীদের উত্থাপিত অনেক অভিযোগ খন্ডন করেছেন। (পূর্বের উদ্ধৃতির দ্রষ্টব্য) অতএব শাস্ত্র যখন বলেছে "যে পাপ করে সেই মরিবে", তখন যীশু কীভাবে অন্যের পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন? তাও অভিশপ্ত মৃত্যু! কারণ বাইবেলে বলা হয়েছে, "কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গানো যায়, সে পাপগ্রস্ত।" (দ্বি: বি: ২১:২৩) আমরা জানি, ভাববাদীগণ ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তারা কখনও অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। যীশু ভাববাদী ছিলেন। অতএব ভাববাদী হবার কারণে তিনি ক্রুশে মৃত্যুর ন্যায় অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করতে পারেন না।

বলা হয়ে থাকে, পাপীদের উদ্ধার এবং মৃতদের ভিতর সুসমাচার প্রচারের জন্য যীশু স্বেচ্ছায় এরূপ মৃত্যুবরণ করেন। এরূপ ধারণাও সঠিক নয় এবং বাইবেল বিরোধী। যীশুর ক্রুশারোহণ ও মৃত্যু যদি ইচ্ছাকৃতই হবে, তবে তিনি কেন বলেছিলেন, "যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপন করত যেন আমি যিহুদীদের হস্তে সমর্পিত না হই।" (যোহন- ১৮:৩৬) এবং বন্দী হবার পূর্বে কেনইবা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, "আব্বা, পিত:, সকলই তোমার সাধ্য। আমার নিকট হইতে এই পানপত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমারই ইচ্ছামত হউক।" (মার্ক-১৪:৩৬)

এখানে যীশু তাঁর বন্দীত্বরূপ পান পাত্রকে তাঁর ইচ্ছামত নয় বলেছেন। অন্য এক স্থান হতে জানা যায়, যখন যিহুদীগণ তাঁকে ক্রুশে লটকিয়েছিল, তখন তিনি ঈশ্বরের নিকট অনুযোগ করে বলেছিলেন, "এলি, এলি, লামা সাবাক্তানী।" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" (মথি- ২৭:৪৬) স্বেচ্ছায় ক্রুশারোহণ করলে কী যীশু এরূপ অনুযোগ করতেন? বাইবেল হতে মৃতদের ভিতর সুসমাচার প্রচারের কোন প্রমাণ মেলে না। বরং সুসমাচার জীবিতদের জন্যই এসে থাকে বলে বাইবেল ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয়েছে, "পাতালতো তোমার স্তবগান করে না, মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না। গর্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না। জীবিত, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান করিবে, আমি যেমন অদ্য করিতেছি।" (যিশাইর-৩৮:১৮-১৯)

অতএব যখন বলা হয়েছে, "গর্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না," তখন যীশু কেন গর্তগামী বা মৃতদের ভিতর সুসমাচার প্রচারের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন? মৃতগণ যখন জীবিত ছিলেন তখন তাদের জন্য আগত ভাববাবীদের দ্বারাই তো ভাববাণী লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর পরতো তারা বিচারের জন্য অপেক্ষমান। এমন অবস্থায় যীশুর সুসমাচার প্রচারের দ্বারা তারা কীভাবে পরিত্রাণ পাবে?

৭। যীশু ক্রুশে মারা যান নাই।

বাইবেলে যীশুর ক্রুশারোহন অধ্যায় সমূহ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায় যে, যীশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ক্রুশে লটকানো হলেও যীশুর প্রার্থনানুযায়ী ঈশ্বর তাকে ক্রুশের অভিশপ্ত মৃত্যু হতে রক্ষা করেছিলেন। যদি প্রকৃতই যীশুর মৃত্যু ক্রুশে হত, তবে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত ব্যক্তি নন বলে প্রমাণিত হতেন, কারণ তখন এটাই সাব্যস্ত হত যে, ঈশ্বর তার কথা শুনেন নাই, এবং যিহুদীদের ধারণাই সত্য বলে প্রকাশ পেত। তারা ভেবেছিল যে, এলীয়া যীশুকে রক্ষা করবেন না। এজন্যই তরা বলেছিল, "দেখি এলিয় তাকে রক্ষা করতে আসেন কি-না" (মথি- ২৭:৪৯) যদি তিনি সত্যিই ক্রুশে মারা যেতেন, তবে কী এটাই প্রমাণিত হত না যে, ঈশ্বর যীশুকে রক্ষা করতে পারেন নাই?

বাস্তবে যীশু ক্রুশে মারা যান নাই, বরং মৃতবৎ হয়েছিলেন। এবং অন্যেরা মনে করেছিল যে তিনি মারা গিয়েছিলেন। মানুষের মৃত্যু হলে

তার শরীর হতে কখনও রক্ত বের হয়না। কিন্তু যীশুর তথাকথিত মৃত্যুর পর একজন সেনা বর্শা দ্বারা তাঁর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করলে রক্ত ও জল বের হয়েছিল। (যোহন- ১৯:৩৪) যীশু যে ক্রুশে মারা যান নাই, যীশুর দেওয়া যোনার দৃষ্টান্ত থেকেও তার প্রমাণ মেলে।

যখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশি তাঁর নিকট কোন চিহ্ন দেখতে চাইলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "এই কালের দুষ্ট ও ব্যাভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে। কিন্তু যোনা ভাববাদীদের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেয়া যাইবে না।

কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন" (মথি- ১২:৩৮-৪০) যোনার দৃষ্টান্ত বা চিহ্নে দেখা যায় যে, তিনি তিন দিবারাত্র তিমি মাছের উদরে মৃতবৎ ছিলেন, মৃতরূপে ছিলেন না। যীশুও যোনার ন্যায় তিন দিবারাত্র তিমি মাছের উদরে মৃতবৎ পৃথিবীর গর্ভে অর্থাৎ কবরে থাকবেন বলেই শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, মৃতরূপে নয়। যীশু যদি সত্যই মারা যেতেন তবে যোনা ভাববাদীর দৃষ্টান্ত তাঁর ভিতর থাকত না। যীশুর জীবনে ক্রুশে লটকানো ঘটনার পরের ঘটনা সমূহ পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাইবেলের নূতন নিয়ম হতে জানা যায় যে, ক্রুশে লটকানোর পর সাধারণত যতক্ষণ ঐ অবস্থায় রাখলে মানুষের মৃত্যু হয়, বিশ্রামবার থাকার কারণে ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই ক্রুশে লটকানো ব্যক্তিদেরকে ক্রুশ হতে নামানোর জন্য ফরীসীগণ পীলাতকে অনুরোধ করেন। যেহেতু নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাদেরকে নামানো হচ্ছিল, তাই ফরীশীগণ পীলাতকে সকলের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তাদের পা ভেঙ্গে দিতে অনুরোধ করে; (যোহন- ১৮:৩৪) যীশুর সহিত অন্য দু'জনকে ক্রুশে লটকানো হয়েছিল। সৈন্যগণ যীশু ব্যতীত অন্য দু'জনের পা ভেঙ্গে ছিল। কিন্তু যীশুর পা ভাঙ্গা হয় নাই। (যোহন- ১৯:৩২-৩৩) ক্রুশে লটকানোর সময় যীশু ছিলেন ৩৩ বৎসরের যুবক। তাঁর স্বাস্থ্যও দুর্বল ছিল না। এরূপ একজন ব্যক্তির সামান্য সময় ক্রুশে থাকার কারণে মৃত্যু হতে পারে না।

এজন্য যীশুকে মৃত বলায় পীলাতও আশ্চর্য হয়েছিলেন, (মার্ক- ১৫:৪৪)। বস্তুত ক্রুশে লটকানোর পর যীশু পিপাসার্তো হওয়ায় তাঁকে সিরকা পান করানো হয়। সিরকার মাদকতায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। যেজন্য তাঁর মাথা ঝুলে পড়ে।এজন্য সবাই তাঁকে মৃত মনে করে। (যোহন- ১৯:২৮-৩০) তিনি যে জীবিত ছিলেন যোহন ১৯:৩৪ আয়াত হতেও তার প্রমাণ মেলে, যার উদ্ধৃতি অনুচ্ছেদটির প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, মৃত বলে সাব্যস্ত যীশুর দেহ হতে বর্শার আঘাতে রক্ত ও জল বের হয়েছিল। রক্ত জীবনী-শক্তির চিহ্ন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মৃতব্যক্তির দেহ হতে রক্ত বের হতে পারে না। তিনি যে ক্রুশ হতে নামানোর সময় জীবিত ছিলেন, এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

যীশুর জীবিত থাকার কথা তাঁর দু'শিষ্য আরি মাথিয়ার যোসেফ ও নীকদীম জানতেন। যে জন্য তাঁরা পিলাতের নিকট হতে যীশুর দেহ চেয়ে নিয়ে গন্ধরশ ও অগুরুর সহিত মশীনা মিশিয়ে কাপড় দিয়ে যীশুর ক্ষতস্থান সমূহে বেঁধে দেন। (যোহন- ১৯:৩৯-৪০)

যিহুদীদের নিয়মানুযায়ী কবর দিবার পূর্বে মৃত ব্যক্তিদের দেহে সুগন্ধি দ্রব্য লাগালেও ক্ষত স্থানে মশীনা লাগানোর কোন প্রচলন ছিল না। বাইবেলের অন্যস্থান হতে জানা যায় যে মশীনা কেবল ক্ষতস্থানের ব্যথা উপসমের জন্যই লাগানো হত। যীশু যদি মৃতই হতেন, তবে তাঁর ক্ষতস্থানে মশীনা লাগানোর যৌক্তিকতা কী? মৃত ব্যক্তির কী কোন ব্যথা থাকতে পারে?

মগ্দালীনী মরিয়ম, য্যাকোবের মাতা মরিয়ম ও শালেমীও যীশুর দেহে সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল মালিসের জন্য তা' কবরে নিয়ে গিয়েছিলেন। (মাক- ১৬:১-৫, লুক-২৩:৫৬) যীশুর যদি মৃত্যুই হত তবে কবরে স্থাপনের পর তাঁর শরীরে তৈল মালিসের প্রয়োজন হয় কেন?

উল্লেখ্য, মার্ক- ১৬:১০ আয়াত হতে জানা যায় যে, যীশুর শিষ্যগণ-মগ্দলীনী মরিয়মের নিকট শুনেছিলেন যে, যীশু জীবিত আছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, যীশু ক্রুশে মারা যান নাই, বরং মৃতবৎ হয়েছিলেন।

৮। যীশুর স্বশরীরে স্বর্গে গমন পবিত্র বাইবেল বিরোধী।

খ্রিষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশু তিন দিন মৃত থাকার পর পুনরুত্থিত হন এবং চল্লিশ দিন আপন শিষ্যবর্গের সহিত অবস্থান করে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন। পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, যীশু প্রকৃতপক্ষে ক্রুশে মারা যান নাই। যেহেতু তিনি মারাই যান নাই, সেহেতু তাঁর পুনরুত্থানের কোন প্রশ্নই উঠে না। আর বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর স্বশরীরে স্বর্গারোহণের ধারণাও সঠিক নয়।

বাইবেলের এক স্থানে বলা হয়েছে "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই, কেবল তিনি, যিনি স্বর্গ হতে নেমেছেন। সেই মনুষ্যপুত্র যিনি স্বর্গে থাকেন।" (যোহন- ১৩:১৪) আয়াতটি প্রথম অংশে বলা হয়েছে, "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই কেবল তিনি, যিনি স্বর্গ হতে নেমেছেন।" অর্থাৎ স্বর্গে কেবলমাত্র তিনিই গমন করতে পারেন, যার আগমন সরাসরি স্বর্গ হতে হয়ে থাকে। পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে "সেই মনুষ্যপুত্র যিনি স্বর্গে থাকেন।" এখানে যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেছেন। আমরা এও জানি যে, তিনি মানব কন্যা মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁর আগমন সরাসরি স্বর্গ হতে হয় নাই, যেহেতু তিনি স্বর্গ হতে নামেন নাই। তাই তিনি স্বশরীরে স্বর্গেও গমন করতে পারেন না। উপরে বর্ণিত আয়াতটিতে যীশু রূপকভাবে কথা বলেছেন। খ্রিষ্টানগণ যা বুঝতে না পারার ভ্রমে পড়েছেন। এজন্যই যীশু বলেছিলেন, "আমি পার্থিব কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর তবে স্বর্গীয় বিষয়ে কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে।" (যোহন- ৩-১২)

(চলবে)

প্রকাশিত হয়েছে

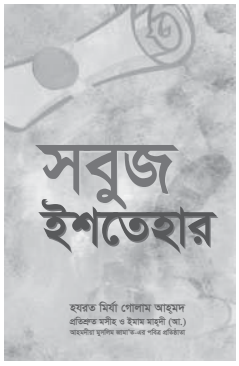

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) 'সবুজ ইশতেহার' নামে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন তা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**

বইটির মূল্য ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

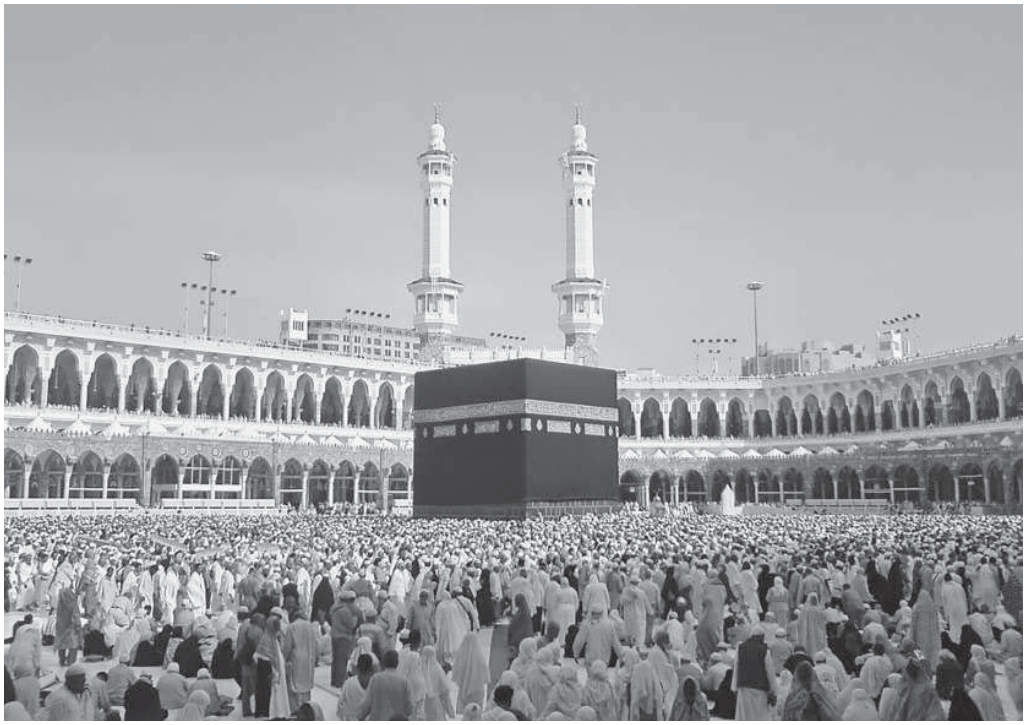

এমন খুব কমই দেখা যাবে, যে-ব্যক্তি হজ্ব থেকে ফিরে এসে আল্লাহ প্রেমিক হয়েছেন, মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন, আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদী নবী (সা.)-এর মত জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন।

প্রেমময় হজ্বের সন্ধানে

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলামী ইবাদতগুলোর মধ্যে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র ঘর 'বায়তুল্লাহ' এবং বিশ্ব নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে। আল্লাহ্ পাকের সাথে প্রেমময় এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির নামই মূলত হজ্ব। মহান রাব্বুল আলামিনকে ভালবাসার উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জিলহজ্ব মাসের ৮ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কাবা এবং কয়েকটি বিশেষ স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী জিয়ারত, তাওয়াফ, অবস্থান করা এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়।

পবিত্র কুরআনে এই ইবাদত সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ রয়েছে- 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা সেসব লোকের জন্য ফরজ, যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে এটা অস্বীকার করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ জগৎসমূহের মোটেও মুখাপেক্ষি নন' (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)।

হজ্বের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্বব্রত পালন করে আর কোন ধরনের অশালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে, সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্ব থেকে ফিরে এলো' (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পয়সার জোরে প্রতিবছরই হজ্ব সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন। হজ্ব পালন করে আসলেই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, এমন এক অদ্ভুত মনমানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। অথচ দেখা যায়, হজ্ব থেকে ফিরে এসে পূর্বের স্বভাবেরই বহির্প্রকাশ ঘটে।

মহান আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হজ্ব করার সামর্থ দান করেছেন, হজ্ব পালনের উদ্দেশ্য তাদের কেবল এটাই হওয়া চাই যে, আল্লাহ্‌কে লাভ করা এবং তার সাথে গভীর প্রেমের এক সম্পর্ক যেন তৈরী হয় আর পূর্বের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মোমেন-মুত্তাকী হয়ে যেন বাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারে। যদি এমনটি হয় যে, হজ্ব থেকে ফিরে এসে পূর্বের মতই জীবন পরিচালিত করতে থাকে, তাহলে তার হজ্ব করা আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য রাখে না। আল্লাহ্‌র সাথে যদি প্রেমময় এক সম্পর্কই সৃষ্টি না হয়, তাহলে এই হজ্ব বৃথা। যারা হজ্বে যান, তাদের মাঝে এমন ক'জন আছেন যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতেই তাদের এই পথ চলা?

এমন লোকদের খুব কমই দেখা যাবে, যে-ব্যক্তি হজ্ব থেকে ফিরে এসে আল্লাহ প্রেমিক হয়েছেন, মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন, আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদী নবী (সা.)-এর মত জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। প্রত্যেক হাজীদের আত্ম-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, আমি কি আল্লাহ্ প্রেমিক হতে পেরেছি? আমার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক তৈরী হয়, তাহলেই আমাদের হজ্ব খোদার দরবারে গৃহিত হবে। কারো হৃদয়ে যদি হজ্ব করার বাসনা থাকে আর সে অনুযায়ী আল্লাহ্ পাকের সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে, তাহলে বায়তুল্লাহ্‌য় উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে হজ্বের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক রাখেন। আমি হজ্বে যাব আল্লাহর ভালবাসায় আর তারই বান্দা আমার প্রতিবেশি না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে, এটাকে কি আল্লাহ্ পাক

মেনে নিবেন?

মহানবী (সা.) একবার বায়তুল্লাহর জিয়ারত না করেও আল্লাহ্ তার হজ্ব কবুল করেছিলেন। ঘটনাটি এমন– হিজরতের ষষ্ঠ বছরে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে যেখানে তিনি (সা.) দেখেছিলেন, তিনি কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করছেন এর ফলে মহানবী (সা.) হজ্বের উদ্দেশ্যে পনেরশত সাহাবীকে নিয়ে মদিনা হতে মক্কার দিকে রওয়ানা হোন এবং মদিনা হতে ছয় মাইল দূরবর্তী মক্কার পথের প্রথম ধাপে জুল হালিফা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন এবং মহানবী (সা.) সকলকে হজ্বের পোষাক পড়তে নির্দেশ দিলেন এবং উচ্চস্বরে তালবিয়া অর্থাৎ 'আমি হাজির', 'প্রভু আমি হাজির', পড়তে লাগলেন। হজ্বের সব প্রস্তুতি থাকা সত্বেও ক্বোরইশরা মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের হজ্ব করতে দিলেন না। মহানবী (সা.) সেবছর হজ্বে না গিয়েও তার সঙ্গীদেরকে হজ্বের উদ্দেশ্যে নেয়া কুরবানীর পশুগুলোকে হুদায়বিয়ার ময়দানেই জবেহ্ করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের মস্তকের কেশ মুন্ডন করতে এবং মদিনায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নিজেও কুরবানীর পশু জবেহ্ করলেন।

মহানবী (সা.)-এর এই হজ্বকে আল্লাহ্ পাক কবুল করেছিলেন এবং তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তার রাসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে পূর্ণ করে দেখালেন। আল্লাহ্ চাইলে তোমরা তোমাদের মাথা কামানো ও চুল ছাটানো অবস্থায় অবশ্যই নিরাপদে ও নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। আর এছাড়া তিনি আরো একটি আসন্ন বিজয় তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন' (সুরা ফাতাহ: ২৮)। সে বছর হজ্ব না করেও মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নকে আল্লাহ্ পাক পূর্ণ করেছেন অর্থাৎ তার হজ্ব গ্রহণ করেছেন এছাড়া পরের বছরই তিনি সাহাবীদের নিয়ে হজ্ব পালন করেছিলেন।

তাহলে ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ মানুষের হৃদয় দেখে থাকেন, কে কোন নিয়তে হজ্ব করতে আসেন, তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। কারো ইচ্ছা যদি থাকে হজ্ব করার, আর সে মানবতার সেবায় সব বিলিয়ে দেয়, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক হজ্বের প্রতিদান দিতে পারেন। তাযকেরাতুল আউলিয়াতে একজন আল্লাহ্-প্রেমিকের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার কারো হজ্ব গ্রহণ হয়নি, কেবল একজনের হজ্ব আল্লাহ্র দরবারে গৃহিত হয়েছিল, যে ব্যক্তির হজ্ব গ্রহণ করা হয়েছিল, তিনি হজ্বের সব প্রস্তুতি নেয়া সত্তেও হজ্বে যেতে পারেননি, তার হৃদয়ে যেহেতু আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন, তাই তার মাধ্যমেই সে বছরের হজ্ব পূর্ণ হয়।

যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০১২ সালের ঈদুল আযহার খুতবার একাংশে বলেছিলেন 'লোক দেখানো হজ্বেও যাওয়া হয়। এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, কার হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে আর কারটা নয়। হজ্ব পালনের ক্ষেত্রে আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, যে আহমদীদের হৃদয়ে হজ্ব করার জন্য ব্যকুলতা রয়েছে আর হজ্ব করতে যেতে পারছে না, তাদের হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে, না তাদেরটা, যাদের অধিকাংশই জুলুম ও অন্যায় করে হজ্বে চলে যায়।'?

অনেকে এমনও রয়েছেন যারা একাধিকবার হজ্ব করেন আর কয়েকবার হজ্ব করা সত্ত্বেও তার মাঝে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, যেমন পূর্বে ছিল তেমনি থেকে যায়। খোদার দরবারে গিয়ে খোদার প্রেমিকই যদি না হওয়া যায়, তাহলে এমন হজ্বের কি কোন মূল্য আছে? এছাড়া হজ্ব সম্পর্ণ করে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তনই যদি না আসে তাহলে এ হজ্ব বৃথা। আমার পাশের ঘরের মানুষ না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে আর আমি হজ্ব করতে যাব, আল্লাহর দরবারে এ ধরণের হজ্বকারীর কোন মূল্য নেই । এছাড়া যারা একবার হজ্ব করেছেন, তারা ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে হজ্ব পালন করার সুযোগ করে দিতে পারেন, যার ফলে দু'জনেই পূণ্য লাভ করতে পারেন। আপনার অর্থ দিয়ে আরেক জনকেও সুযোগ করে দিন না আল্লাহ্র সাথে প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তোলার। ইতোমধ্যে আমাদের দেশ থেকে হজ্বে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে, তাই যারা হজ্বে যাচ্ছেন, তাদের মাথায় একটাই চিন্তা থাকা চাই, কিভাবে আমি আল্লাহ্র সাথে গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হবো আর ফিরে এসে যেন মানবপ্রেমী হতে পারেন এই দোয়াই আল্লাহ্ পাকের কাছে করবেন।

যারা হজ্বে যাচ্ছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে সঠিক নিয়তে সুন্দর ও সুস্থমতে হজ্ব পালন করার তৌফিক দান করুন এবং সবার হজ্ব হউক কেবলমাত্র প্রেমময় আল্লাহ্কে লাভ করার হজ্ব, আমীন।

masumon83@yahoo.com

প্রকাশিত হয়েছে

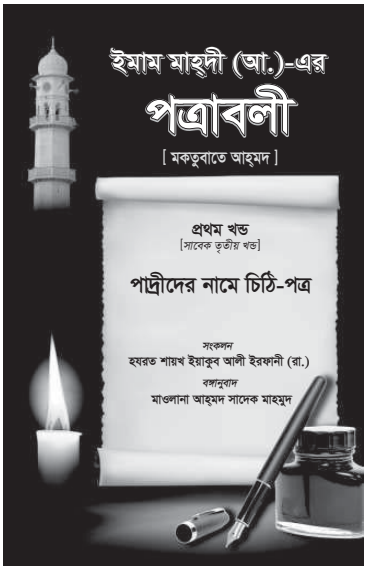

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

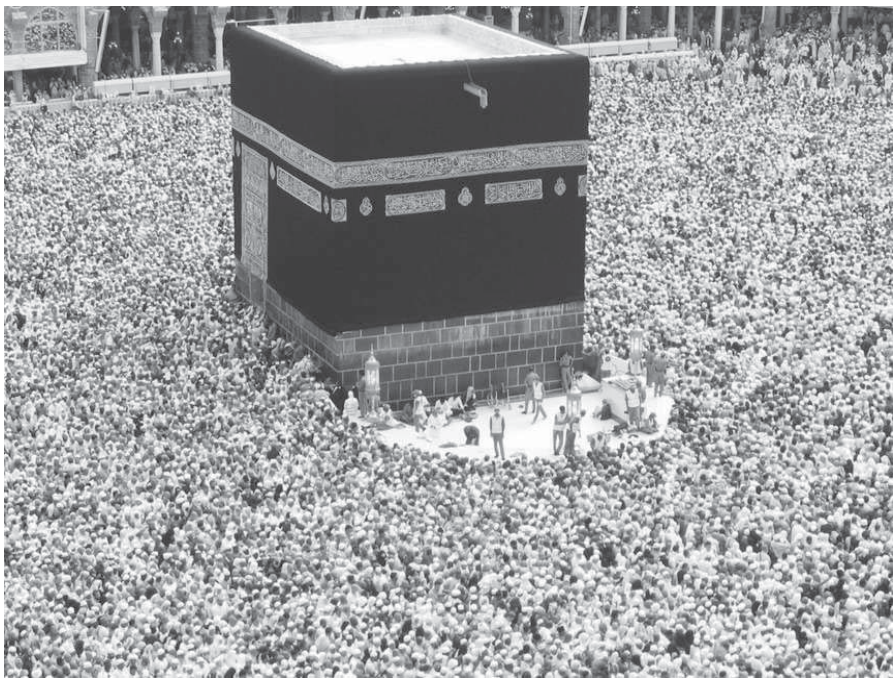

ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। হজ্বের আভিধানিক অর্থ সংকল্প বা ইচ্ছা। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য পবিত্র কাবা জিয়ারত, তোয়াফ ও সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সুচারুরূপে সম্পাদন করার নাম হজ্ব। হজ্বের উদ্দেশ্য ব্যাপক। আসলে ইসলামের প্রতিটি অনুষ্ঠানই কোন নিছক অনুষ্ঠান নয়। ব্যাপক পরিসরে জীবন, জীবনের বাস্তবতা, এর উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য লাভ করার নির্বিঘ্ন যাত্রা এবং গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছার ব্যবস্থা। পবিত্র কাবাগৃহ হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক পুন:নির্মিত এবং সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক ও সময়ে পুন:সংস্কারকৃত কাবার সাথে শরীয়ত, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-মানবতা, বিশ্ব-ঐক্য ও বিশ্ব-শান্তির মূল রূপরেখা সুগভীর ভাবে প্রোথিত। আর এর মূল অবকাঠামো হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে কেন্দ্র করে রচিত।

কাবা মুসলমানদের কিবলা। কাবা তৌহিদের প্রতীক, কাবা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-অর্থনৈতিক মুক্তির দিশারী। যারা ইসলামের আনুষ্ঠানিকতা, আচার-আচরণের ঘোর রহস্য অনুধাবন করতে পারে, তারা ভিন্ন এ সব রহস্য অনুধাবন করা কঠিন। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার উপাসনার জন্য আর তার পূর্ণাঙ্গ রূপ যে সত্তায় রূপ লাভ করেছে, তিনি হলেন ইহ-পরকালের বাদশাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন, "যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে এ বিশ্ব সৃষ্টি করতাম না" অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সৃষ্টির অণু পরমাণু সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, সবই তাঁর সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারা সার্বক্ষণিক এই মহান রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন। অতএব হে বিশ্ববাসীরা তোমরা এই রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক– আর তা শুধু তাসবীহ টিপে আর মুখে যপ করেই সম্পাদন হতে পারে না। সংকল্পের প্রয়োজন আছে, তবে তা জীবনে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা জরুরী। হজ্ব ও হুযূর (সা.) এর জীবনের অনুসরণে আমরা সম্পাদন করি।

আল্লাহ্‌র আদেশে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হজ্ব সম্পাদন করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, জীবনের প্রতিটি কাজ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণে সম্পাদন করা জরুরী। খতমে নবুওয়াতের মত রাস্তায় মিছিল বের করে, ফতোয়াবাজী করে আর রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ বাস্তবায়ন করেছেন এবং চিরস্থায়ী জীবন-ব্যবস্থা দান করেছেন, পবিত্র হজ্বব্রত তেমনই ব্যবস্থা যা ফরজ তাদের জন্য, যারা সামর্থবান; শর্ত-যাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। সংসার চালিয়ে যাতায়াতের খরচ সংকুলান হলে, পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে, শারিরীক সামর্থ্য এবং নারীদের ক্ষেত্রে বৈধ সঙ্গী থাকলে জীবনে অন্তত একবার হজ্বব্রত পালন করতে হয়।

সঠিক ভাবে হজ্বব্রত সম্পাদনের পর মানুষ

তেমনিভাবে পবিত্র হয়, যেভাবে একটি নবজাত শিশু পবিত্রাবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। ইহরাম অবস্থায়, হজ্ব ও ওমরাতে যে তালবীয়া পাঠ করা ফরজ, তা হল "লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়া নি' মাতালাকা ওয়াল মূলকা, লা শরীকালাকা" অর্থ–উপস্থিত হে আল্লাহ্, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, আমি উপস্থিত, নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা এবং অশেষ অনুগ্রহের তুমিই মালিক এবং আধিপত্যেরও। তোমার কোন অশীদার নেই।" হজ্বের অনুষ্ঠানমালায় ছাফা মারওয়া, মুজদালিফা, মীনা, আরাফাত ও রমির আনুষ্ঠানিকতার পরই প্রতিকী। হজ্বব্রতে মীনাতে কুরবানী করতে হয়। কুরবানী ছাড়া ইসলামে সফলতা নেই–যারা অসমর্থ, তাদের রোযার মাধ্যমে (১০টি) তা পূরণ করতে হয়।

হজ্বের মাধ্যমে নিবেদিত-প্রাণ হাজীরা এমন ভাবেই আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হন, যেন তারা আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ করেন। তৌহীদের শিক্ষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শে এ হজ্ব। তাই ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব অপরীসীম। জুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ্ পাক প্রকৃত ইসলামী সভ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকাতলে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করুন এবং মাকামে মাহমুদ দান করুন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

হজ্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাক্‌ওয়া অর্জন করা

"হজ্ব " শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। এর পারিভাষিক অর্থ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে শরীয়তের নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট সময়ে কাবা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহ জিয়ারত করা। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হলো হজ্ব। হজ্ব হলো দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সূরা আলে ইমরানের ১০ম রুকুতে বর্ণিত আছে, "কা'বা গৃহের হজ্ব সেই সকল লোকের ওপরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা সেই স্থানে যাবার যোগ্যতা রাখে।" পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম ইবাদত-গৃহ হলো "কা'বা"। হযরত আদম (আ.) ইহা নির্মাণ করেছিলেন। যখন ইবাদত-গৃহটি বিলীন হবার পথে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এই সু-প্রাচীন ইবাদত-গৃহটিকে পুন:নির্মাণের আদেশ দেন–"ওয়া আজ্জিন ফিন্নাসী বিল্‌হাজ্ব " অর্থাৎ হজ্বের ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'লা বললেন, "হে ইব্রাহীম এ আদেশ শুধু তোমার জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য।" আজ অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলাম-ধর্মানুসারীগণ পবিত্র এ কা'বা শরীফে হজ্বের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে আসছে, যা সকল বর্ণের মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হজ্বের আরো একটি প্রধান শিক্ষা হলো মুসলমানদের অন্তরে কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করা। মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে বিশ্ব-শান্তির পথকে সুগম করার সুযোগ লাভ করে।

হজ্ব কুরবানীর সংকেত প্রকাশ করে। ইহা একটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান, যার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যই হলো সকল প্রকার সম্পর্ককে ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিজকে উৎসর্গ করা। সমস্ত পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে উৎসর্গ করাই হজ্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই যদি কেউ স্বপ্নে হজ্ব করতে দেখে তাহলে এর তাবির "উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া"। মানব জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।

ইসলামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে একটি ভেড়া যেমন কুরবানীর জন্য নিজেকে সম্পন্ন করে, তদ্রূপ মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট তার যাবতীয় ইচ্ছা, অনুরাগ ও সংকল্প বিসর্জন দিয়ে নিজেকে সমর্পন করে। তেরশত বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে ধার্মিক বান্দা নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিতো। সেটাই ছিল প্রকৃত "বড় ঈদ"।

মোটকথা বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনের ভাবই গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভূর নিকট কুরবানী করে। (মালফুযাত থেকে) হজ্বের প্রতীকি কাজগুলোর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

হযরত ওয়ায়েস কুরনী (রা.) এর সময়ে এক বছর হজ্বে প্রচুর হাজীর শুভাগমন ঘটেছিল। জনৈক হাজীকে আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম যোগে জ্ঞাত করলেন যে এ বছর মাত্র একজনের হজ্ব কুবল করা হয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, যার কথা জানানো হয়েছে তিনি সে বছর হজ্বেই যেতে পারেন নি। খোঁজ নিয়ে আরো জানা গেল যে, ঐ ব্যক্তি সারা জীবন জুতা সেলাই করে সংসার চালিয়ে এর মধ্য থেকে হজ্বে যাবার নিয়্যতে কিছু অর্থ জমিয়েছিলেন। হজ্বে যাবার প্রস্তুতি কালে প্রতিবেশীর অসুখের সময়ে তিনি ভাবলেন, 'আমি বেঁচে থাকলে আবার টাকা জমাতে পারবো, বিনা চিকিৎসায় যদি প্রতিবেশীর মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে আমি কি জবাব দেবো'?

তাই তিনি প্রতিবেশীকে অর্থগুলি দিলেন। কাজ করেছেন হাত দিয়ে কিন্তু অন্তর তার যিক্‌রে ইলাহীতে সর্বদা রত ছিল। এজন্যই মহান প্রভু বোধ হয় তার হজ্ব কবুল করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্!) দুনিয়ার কত লোক আছে যারা নানান ভাবে উপার্জিত টাকা জমিয়ে হজ্ব করতে যায় এবং "হাজী" নামে নিজেদেরকে সমাজে সম্মানিত-ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে! কিন্তু রিয়া বা লোক দেখানো কাজকে খোদা তা'লা পছন্দ করেন না। বৃদ্ধ মা-বাবা বেঁচে থাকলে তাঁদের দেখাশুনা করাও হজ্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। হজ্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাক্‌ওয়া অর্জন করা।

অতএব ইসলাম ধর্মে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

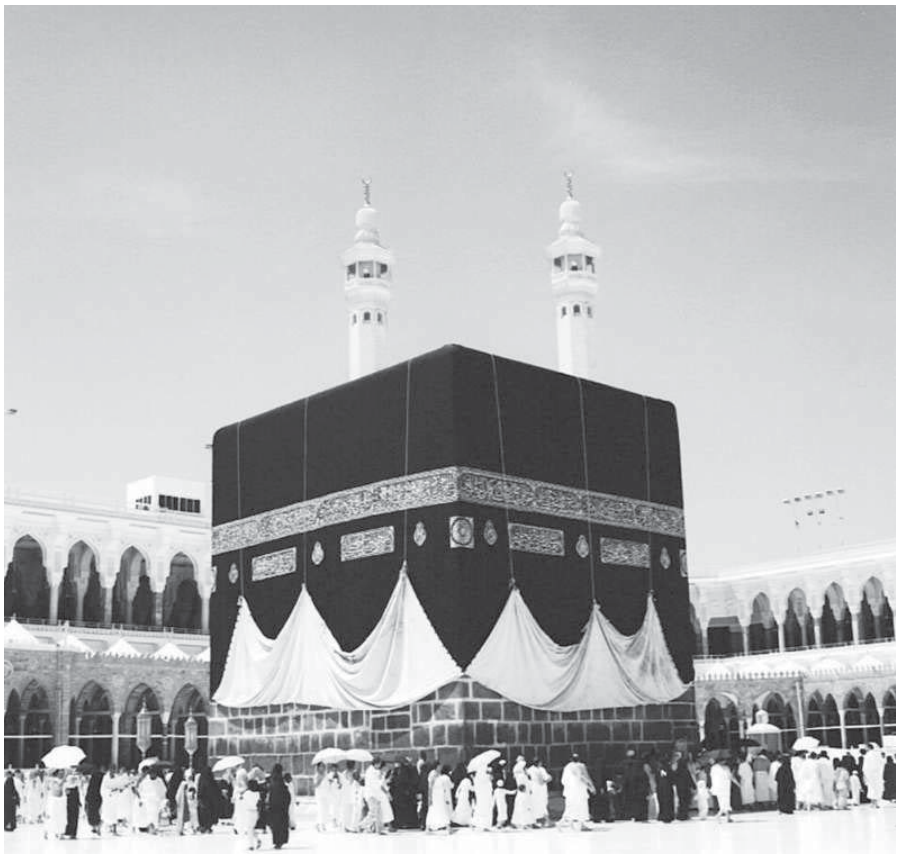

হজ্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয়

পবিত্র কুরআনে হজ্ব সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে- আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরে হজ্ব করা সেসব লোকের জন্য ফরজ যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ রাখে। কিন্তু যে এটা অস্বীকার করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌ জগতসমূহের মোটেও মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান : ৯৮) হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্বব্রত পালন করে আর কোন ধরনের অসালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্ব থেকে ফিরে এলো। একজন হাজী হজ্ব পালন করার সময় বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। যেমন, ইহরাম বাধা, বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফ, সাফা মারওয়া, পাহাড়ের মাঝে সাত পাক দেয়া, আরাফাতে অবস্থান, মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থান, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, তোয়াফ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন, হজ্ব করতে যাওয়াই যথেষ্ঠ নয়। হজ্ব করে ফিরে আসাটাও তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্চর্য কথা এই যে, মানুষ যাবার বিষয়টিকে তো গুরুত্ব দেয় কিন্তু ফিরে আসাকে কোন গুরুত্ব দেয় না যে, কি অবস্থায় ফিরে আসলো। এখানে এই কথার তাৎপর্য এই যে, যদি তোমরা এসব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থেকেও যাও, যদি কিছু কমতি থেকেও যায় তাহলে হজ্ব এসব দুর্বলতার কমতিগুলো পূরণ করে এবং পবিত্র স্থানগুলো দর্শনের ফলে তোমাদের অন্তরকে পবিত্র পরিশ্রুত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে।

অনেক এমন লোক আছে হজ্ব থেকে বিফল মনোরথ ও কঠিন হৃদয় নিয়ে ফিরে আসে। কতক হাজী আছেন যারা তাক্‌ওয়ার বড়াই করে হজ্বে যান কিন্তু ফিরে আসেন এমন অবস্থায় যে, আগের চেয়েও বেশী অপরাধে লিপ্ত হয়ে যান। বিফল মনোরথ ও কঠোর হৃদয় নিয়ে ফিরে আসেন। এর কারণ তো ইহাই যে, সেখানকার মাহাত্ম তাদের জানা হয় না। সেখানকার কল্যাণসমূহ বঞ্চিত থেকে যায়। তাদের অপকর্মের কারণে। কেননা অপকর্মসমূহ এমন মজবুত রং ধারন করে যে, কোন পানি দ্বারা ধোলাই করা যায় না।

এজন্য আবশ্যক যে, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সেবা নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে কিছু সময় কাটানো যেন অভ্যন্তরিন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এবং সততা ও নিষ্ঠা পরিপূর্ণ ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) বলেন, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, অসংখ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং নানা ভাষাভাষির হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় একত্রিত হয়ে এ সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে যে, তাদের মধ্যে বর্ণ, গোত্র ও ভাষার শত শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের তৌহিদ-মন্ত্র তাদেরকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। সমবেত মুসলিমরা তাদের কর্ম দিয়ে এটিও প্রমাণ করে যে, এ কাবা গৃহের হেফাজতের জন্য তারা সদা প্রস্তুত এবং কোন শক্তিই কাবার বিনাশ ও মুসলমানের একতাকে নষ্ট করতে সক্ষম নয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহে.) বলেন, হজ্বের প্রস্তুতির জন্য সমগ্র দুনিয়ার উম্মতকে শেখানো হয়েছে যে, পরিশেষে যখন উম্মতে ওয়াহেদা- একই মন্ডলী বানানো হবে। মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর হাতে সমগ্র জগতের সকল লোক একই হাতে এবং একই পতাকা তলে সমবেত হবে তখন তাকে বলে হজ্বে আকবর, সর্বশেষ হজ্ব এর শেষ দিন হবে সেদিন। আমরা আহমদী জামা'ত। আমাদেরকে এই কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে এবং এ মহান উদ্দেশ্যের জন্য সেবক নির্ধারিত করা হয়েছে।

আর আমি বিন্দু মাত্র সন্দেহ ব্যতিরেকে দৃঢ় পত্যয়ের সাথে খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, ঐ হজ্ব যা আগামী যুগে জামা'তে আহমদীয়ার খেদমতের ফলশ্রুতিতে খোদার নিকট গৃহীত হবে এর ফলশ্রুতিতে পরিশেষে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর খাতিরে সমগ্র মানবমন্ডলী ঐ হজ্ব পালন করবে, যা আন্তর্জাতিক হজ্বে পরিণত হবে, যা আগামী দিনগুলোতে অবশ্যই হবে। ঐ হজ্ব প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আদায়কৃত হজ্বের পর হজ্বে আকবর হবে। যদ্বারা সমগ্র বিশ্বের মানুষ একীভূত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে হজ্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের নৈতিকতার উন্নতির এক ঐশী পরিবর্তন সাধন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহমদ উজ্জল, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আল্লাহ্ মানবজাতির ওপর হজ্ব ফরজ করেছেন

হজ্ব ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজ্বের আভিধানিক অর্থ হল সংকল্প বা ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী কা'বা শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্ব বলা হয়। ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক বছরই সামর্থ্যবান মুসলমান নর-নারী হজ্ব পালন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "ওয়া লিল্লাহি আলান্‌নাসি হিজ্জুল বায়তি মানিস্তাতাআ ইলায়হি সাবীলা" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্ব করা সেই সকল লোকের জন্য ফরজ করা হয়েছে, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান :৯৮)

এথেকে বুঝায় যায়, প্রত্যেক সামর্থ্যবান লোকদের জন্য হজ্ব করা ফরজ। হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সামর্থ্যবান লোকদের জন্য হজ্ব করা ফরজ। সামর্থ্য থাকা সত্বেও কোন ব্যক্তি যদি হজ্ব পালন না করলো, কি-না, সে ইহুদী বা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নেই। (তিরমিযী)

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমারদের ওপর হজ্ব ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্বব্রত পালন কর। এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য? হুযূর (সা.) বললেন, 'যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরজ হয়ে যেত। আর যদি ফরজ হয়ে যেত, তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতেও না। (আহমদ নিসাই ও দারেমী) এথেকে বুঝা যায়, সামর্থ্য থাকা লোকদের জন্য হজ্ব জীবনে একবার পালন করা উচিত। আর যে অধিকবার হজ্ব করে, সেটা তার নফল ইবাদতে শামিল হবে। হাদীসে আরও আছে কারো সামর্থ্য থাকা সত্বেও যদি অসুস্থতার কারণে হজ্ব পালন করতে না পারে, তবে সে অন্য কাউকে দিয়েও হজ্ব পালন করাতে পারবে।

আমাদের সমাজে অনেক বৃত্তবান লোক রয়েছে, যারা সামর্থ্য রাখে কিন্তু হজ্ব পালন করে না। আবার অনেকে আছে, লোকদেরকে দেখানোর জন্য হজ্ব পালন করে থাকে। লোক দেখানো হজ্ব মূলত প্রকৃত হজ্ব নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, হজ্ব অর্থ এই নয় যে, তারা ন্যায় ও অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্ব করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্বের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্ব যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভঙ্গিতে নিয়োজিত হবে। এজন্য প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ তারই প্রত্যাশিত রূপ।" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ)

হজ্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের ভালভাবে জানা উচিত। যারা হজ্ব পালন করে এসেছে, তাদের উচিত, হজ্বের নিয়ম-কানুন মেনে চলা, আর যারা এবছর হজ্বে যাচ্ছেন তাদেরও উচিৎ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরেই যেন হয় এ যাত্রা। তবেই আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত হজ্ব-পালনকারী হিসেবে মনে করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে হজ্বের গুরুত্ব বুঝার এবং সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের হজ্ব পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া, নাটোর

হজ্ব একটি আধ্যাত্মিক সফর

ইসলাম ৫টি স্তম্ভের ওপর দন্ডায়মান। এই ৫টি স্তম্ভের মধ্যে হজ্ব একটি অন্যতম স্তম্ভ। হজ্বের আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প বা ইচ্ছা করা। সহজ ভাষায়, "৮ই যিলহজ্ব হতে ১৩ই যিলহজ্ব পর্যন্ত মেয়াদের মধ্যে কা'বা শরীফে অনুষ্ঠিত ইসলাম-নির্ধারিত কর্মকে হজ্ব বলে।" এবং ইসলামী পরিভাষায় "শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাবা শরীফ দর্শনের উদ্দেশ্যে গিয়ে, নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্ব বলে।"

আল্লাহ্ তা'লা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ওপর হজ্ব পালন বাধ্যতা মূলক করেছেন। কেননা, হজ্ব পালন একটি ব্যয়বহুল ইবাদত যা পালন করা দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। হজ্ব একটি আধ্যাত্মিক সফর যা পূর্ণ করলে একজন ব্যক্তি সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। তবে অবশ্যই সেই হজ্ব হতে হবে ইসলাম সম্মত, লোক দেখানো নয়।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে হজ্ব সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ৯৭-৯৮ নম্বর আয়াতে বলেন, "মানুষের মধ্যে সর্বাগ্রে যে ঘর তৈরী হয়েছিল তা বাক্কায়; যারা সামর্থ্যবান, তাদের ওপর এ ঘরে হজ্ব করা কর্তব্য।"

উপরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নিজে হজ্বের হুকুম দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন "সামর্থ্য থাকা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি হজ্ব আদায় না করে, তাহলে সে ইহুদী কিম্বা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যু বরণ করল।" (তিরমিযী)

মুসলিম গৃহে জন্ম গ্রহণের পর কোন সামর্থ্যবান ব্যক্তি, তার ধর্মকে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও লালন করা সত্বেও সে যদি হজ্ব আদায় না করে তবে সে অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার, এটি নি:সন্দেহে এক অভিশপ্ত মৃত্যু। এতে একজন মানুষের সারা জীবনের সমস্ত নেক কাজ ধুলিষ্যাৎ হয়ে যাবে এক নিমিষে।

প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান ব্যক্তির হজ্ব পালন করা উচিত, যদি সে পরকাল পর্যন্ত নিজেকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে স্থির রাখতে চায়, মক্কা হলো সেই পবিত্র স্থান, যেখানে আমাদের প্রিয় নবী করীম (সা.) জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্মজীবন কাটান।এমনই এক স্থানের ধুলিকণা স্পর্শ করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। মহান করুণাময় খোদা তো সেই উপযুক্ত জায়গাতেই হজ্বের নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা হলো ইসলামের মূল কেন্দ্র। প্রতি বছর হজ্বের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান ভাই ও বোনেরা এই মূল কেন্দ্রে একত্রিত হন। সেখানে লক্ষ কণ্ঠে সেখানে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনিত হয়। পরিশেষে আমি এই বলে শেষ করতে চাই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর "তফসীরে কবীর" এ সূরা হজ্বের ব্যাখ্যা প্রদানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "আমি ইব্রাহীমকে ইহাও বলেছি যে এ হুকুম শুধু তোমার জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য।" আল্লাহ্‌র এ হুকুম পালনে যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পবিত্র মক্কায় একত্রিত হোক এই দোয়া করে শেষ করছি।

শায়লা আক্তার শান্তি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হজ্ব যাত্রীগণ আল্লাহ্‌র মেহমান

'হজ্ব' ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজ্বের আভিধানিক অর্থ হল সংকল্প বা ইচ্ছা প্রকাশ করা। শরীয়ত অনুযায়ী কাবা শরীফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে-নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্ব বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা হজ্ব সম্পর্কে বলেন, "কাব শরীফের হজ্ব সেইসব লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক যারা সেখানে যাবার ক্ষমতা রাখে।" এই আয়াদ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সুস্থ সামর্থবান ও শক্তিশালী ব্যক্তিরাই হজ্ব পালনের দাবী রাখে। হজ্ব সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি হজ্ব আদায় না করলে সে ইহুদী/খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সে বিষয়ে আমার কোন দায় দায়িত্ব নেই। (তিরমিযী)

উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক বলা যায় যে, নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিরাই হজ্বের যোগ্যতা রাখে। যেমন (১) স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি (২) প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান (৩) হজ্বে আর্থিক সংগতি (৪) নিরাপত্তা ইত্যাদি হল হজ্ব পালনের প্রধান শর্ত। এছাড়া অন্যান্য বিষয়াদির খেয়াল রাখাও হজ্বের আওতায় পরে। সমগ্র বিশ্বের সামর্থ্যবান মুসলমান এক মহান মিলন মেলার সৃষ্টি হয় কাবাগৃহে। কারণ এমনিতেই কোন মুসলমান অন্য দেশের মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে না। কিন্তু হজ্বের বদৌলতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একটি মহা আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, হজ্বের সময় সকল মানুষের একটিই পরিচয় আর তা হল সবাই আল্লাহ্‌কে ডাকার অথবা তাঁর নির্দেশ পালন করার জন্য একত্রিত হয়। হজ্ব পালনের কতিপয় নিয়ম রয়েছে যেমন (১) ইহরাম, (২) তোয়াফ (৩) সয়ী (৪) উকুফে আরাফাত (৫) মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থান (৬) কংকর নিক্ষেপ (৭) কুরবানী করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলো পালন করার মাধ্যমেই হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। হজ্বে যে সমস্ত মুসলমানরা যান তারা মূলত আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক মেহমান হয়ে থাকেন। কেননা যারা হজ্বে প্রথমবারের মত যান তাদের মধ্যে পুণ্যময় মিলনের এক মহা আনন্দ খেলা করে। প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ তা'লার হুকুম ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশ পালন করার জন্যই তাঁরা কাবা গৃহে মিলিত হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক কাবা গৃহে যান তাদের মধ্যে জাতীয়, ভাষাগত, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধরক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের তৌহিদী মন্ত্র তাদের একই সূত্রে গেঁথে দেয়। আর এটি দিয়েই হাজীরা প্রমাণ করেন যে, কাবাগৃহের হেফাজতের জন্য তারা তৈরী এবং কোন অবস্থাতেই কাবা গৃহকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না।

পরিশেষে বলা যায়, হাজীরা একে অপরের দর্শন লাভ এবং আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করার তৌফিক লাভ করেন যা তাদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগে। মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে এ কামনাই করি, সকলের হজ্ব যেন প্রকৃত অর্থে হজ্ব হয় এবং তিনি যেন গ্রহণ করেন।

শেখ মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ্, ঘাটুরা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"সন্তানের সুশিক্ষায় পিতা-মাতার ভূমিকা"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ অক্টোবর, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী চার সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। বন্ধু নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা
২। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য
৩। প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা
৪। ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার ৩১ বৈশাখ ১৪২০
১৪ মে ২০১৩

হেফাজতী নেতাদেরকে কে দিয়েছে ইসলামের ঠিকাদারির দায়িত্ব?

হেফাজতে ইসলামের নামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবার কথা। প্রথমে যদি প্রশ্ন করি হেফাজতে ইসলামের নাম ধারণ করে যারা বসে আছেন তাদেরকে এইভাবে ইসলামের হেফাজত করার দায়িত্ব কে দিয়েছেন? যেহেতু ইসলামের সাথে এর একটি সম্বন্ধ আছে তাই কুরআনের একটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি। কুরআনে আছে আল্লাহ বলছেন- 'নিঃসন্দেহে আমরা নিজেই স্মারকগ্রন্থ অবতরণ করেছি, আর আমরাই তো এর সংরক্ষণকারী। (সূরা আল হিজর, আয়াত-৯)। তাহলে তাদেরকে ইসলামের হেফাজত করার দায়িত্ব কি আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন? তাও শাপলা চত্বরে যে সকল ঘটনা ঘটানো হলো সেইগুলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা ইসলামের শিক্ষা এই হেফাজতীদের মধ্যে পাইনি। ডা. ইমরান এইচ সরকার বার বার বলেছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ছাড়া অন্য কোন দাবি নেই। এইসব বলার পরও তাদেরকে অমুসলিম, নাস্তিক বলার কারণ কি? হেফাজতী নেতাদেরকে কে দিয়েছে ইসলামের ঠিকাদারির দায়িত্ব। এটা সকলেই জানে যে রসুল করীম (সা.) বলেছেন-যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করবে সে অবশ্যই মুসলিম। হেফাজতীরা বলবে এরা মুখে বলছে অন্তরে অন্যকিছু। তার মানে এরা মুনাফিক। আমরা বলবো মদীনার সবচাইতে বড় মুনাফিক যে ছিলো তার জানাজার নামাজও রসুল করীম (সা.) পড়েছিলেন। মুনাফিক জানার পরও মুসলমান হিসাবে জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন। এতোকিছু জানার পরও হেফাজতীরা নিজেদের হাতে ইসলামের ঠিকাদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জোর করে অন্যজনের মুসলমানিত্বের অধিকারও কেড়ে নিচ্ছেন। ইসলামকে পুঁজি করে দেশের সাধারণ জনগণের মনে আতঙ্ক তৈরি করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করাতো হেফাজতের কাজ নয়। এই হেফাজতীদেরকে যারাই সমর্থন যোগাবে তাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে তারা কি করছেন।

মোহাম্মদ এহিয়া
মিরপুর ল' কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

ভোরের কাগজ
ঢাকা শুক্রবার ২৯ ভাদ্র ১৪২০ ● ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩

তেঁতুল হুজুর ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

তথাকথিত হেফাজতের আমির আল্লামা শফী সম্প্রতি নারীদের তেঁতুলের সঙ্গে যে তুলনা করেছেন এতে শুধু নারী সমাজেরই সম্মানহানি করেননি বরং তিনি কোরআন ও মহানবী (সা.)-এরও অবমাননা করেছেন। নারীদের সম্পর্কে এ ধরনের নোংরা বক্তব্য দিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছেন তিনি কতোটুকু ইসলামের হেফাজতকারী।

ইসলাম ও বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করেছেন। মানব মন ও মানব সমাজে নারী প্রগতির গোড়াপত্তন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। ইসলামে নারীর স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক বাক্-স্বাধীনতা আছে। নর-নারী উভয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে স্বীকৃত এবং কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ লাভের সমঅধিকার প্রাপ্য। যেভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন, 'তিনি তোমাদের এক-ই সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনসঙ্গিনীকে একই উপাদান হতে সৃষ্টি করেছেন' (সূরা নিসা-আয়াত: ১)। অপর এক স্থানে আল্লাহ বলছেন, 'যে ব্যক্তি মোমেন অবস্থায় সৎকর্ম করবে সে পুরুষ হোক বা নারী সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (সূরা মোমেন-আয়াত: ৪০)।

ইসলামের কষ্টিপাথরে নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম নারীকে শুধু পুরুষের সমঅধিকার নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ থেকে নারীকে অধিক মর্যাদা দিয়েছে। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত ঘোষণা করে ইসলাম নারী জাতিকে সর্বোত্তম মর্যাদায় ভূষিত করেছে। যে মর্যাদা পুরুষকে দেয়া হয়নি। ইসলামে একজন নারী একজন পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। পারিবারিক জীবনে সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য থাকলেও সার্বিক মূল্যায়নে ইসলাম নারী জাতিকে পুরুষের অধিক মান-মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্য কোন ধর্ম বা জাতিতে করেনি। ইসলাম পর্দা প্রথাকে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো শ্রেণীগত পার্থক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। ইসলাম নর-নারী উভয়কে পর্দার আদেশ প্রদান করেছে। যেমন বলা হয়েছে, 'হে নবী! মোমেন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি বিনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি' (সূরা নূর: ৩০)। এর পরের আয়াতে বলা হচ্ছে, 'হে নবী! মোমেন স্ত্রীলোকদের বলুন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে' (সূরা নূর: ৩১)। ইসলাম নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কোন আদেশ-নিষেধও করেননি আবার তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেনি।

পবিত্র কোরআন পাঠে দেখা যায় ইসলামের শিক্ষা সবার জন্য, কোথাও বলা হয়েছে, হে মানবমণ্ডলী, আবার কোথাও বলা হয়েছে মোমেনগণ বা হে যারা ঈমান এনেছ। এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহতায়ালা নিজেই নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করেননি। যেভাবে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ যে-ই ভালো কাজ করবে সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এছাড়া ইসলামে নারী জাতির অবদান অনেক। সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার মর্যাদাও লাভ করেছিলেন একজন নারীই। ইসলামের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থের জোগানও দিয়েছিলেন একজন নারীই। ইসলামের পক্ষে জেহাদ করতে গিয়েও সর্বপ্রথম যিনি নিজের জীবন দান করেন তিনিও ছিলেন একজন নারী। যেখানে আল্লাহ নিজেই নারী-পুরুষের মর্যাদা নিশ্চত করেছেন সেখানে নারীদের নিয়ে আল্লামা শফীর এ ধরনের মন্তব্য করা কি ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থি নয়?

তথাকথিত হেফাজতিরা যে আসলেই প্রকৃত ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখে না তা আবারো তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে। এছাড়া গত মে মাসে এই ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠন হেফজতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি পবিত্র কোরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদিস। যাদের হাত থেকে পবিত্র কোরআন পর্যন্ত রক্ষা পায়নি, যাদের কাছে কোরআনের কোনো মূল্য নেই তারা আবার কিভাবে ইসলামের কথা মুখে উচ্চারণ করে? এরা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় সন্ত্রাসী, এরা কখনো মুসলমান হতে পারে না। তথাকথিত হেফাজতিরা পবিত্র কোরআনের অবমূল্যায়ন করে সমগ্র মুসলমানের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল সেদিন আর এখন নারীদের নিয়ে এমন মন্তব্য করে মাতৃজাতিকে যেমন অপমান করেছে তেমনি ইসলামের অবমাননা করেছে। সরকারের উচিত হবে, যারা এ ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে জড়িত এবং যাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে এ দেশের শান্তি বিনষ্ট হয় এবং ইসলামের অবমাননা হয় তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা।

ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কখনও ইসলাম সমর্থন করে না। আজ যারা 'হেফাজতে ইসলাম' নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে তাদের বলতে চাই, ইসলামের হেফাজত করা কার দায়িত্ব? যিনি ইসলামকে এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন তার না আপনাদের? ইসলামের হেফাজতের কথা বলে সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষদের করা হচ্ছে বিভ্রান্ত। এর দায়ভার কি আপনাদের নিতে হবে না? ইসলামকে কিভাবে হেফাজত করতে হবে এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। ভাবতে অবাগ লাগে ইসলামবিরোধী এমন কথা বলা সত্ত্বেও কিভাবে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য সৈয়দা আশিফা আশরাফী পাপিয়া একজন নারী হয়ে আল্লামা শফীর পক্ষেই সাফাই গেয়েছিলেন সংসদে। যেখানে আল্লামা শফী নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাবিরোধী বক্তব্য রাখলেন আর সেই বক্তব্যের পক্ষেই কথা বলছেন আরেক নারী। ধিক্কার এসব নারী নামে কলঙ্কদের। মানুষের অধঃপতন যখন হয় তখন তার কাছে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক– সে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য একজন নারীর কাছ থেকে জাতি আশা করেনি। আল্লামা শফী যেমন ভুলে গিয়েছিলেন তিনি যে একজন নারীরই সন্তান এবং একজন নারীর দুধ পান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে পাপিয়াও ভুলেগেছেন তিনিও যে একজন নারী। যদি তিনি নিজেকে একজন নারী মনে করতেন তাহলে কখনো আল্লামা শফীর পক্ষে কথা বলার জন্য দাঁড়াতেন না।

কোরআনের অবমাননা যারা করতে পারে তাদের মুখ থেকে শুধু নারীদের নিয়ে নয় আরো কতো কিছুই যে বের হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই স্পষ্টভাবে হেফাজতিদের বলতে চাই, ধর্মের লেবাস পরে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত অনেক করেছেন, আর করার সাহস না দেখানোটাই উত্তম হবে। হেফাজতের নামে যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে সব স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সেই সাথে প্রতিটি নারীকে সোচ্চার হতে হবে।

মাহমুদ আহমদ সুমন : লেখক।
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

খুলনা জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার উদ্যোগে ৩০-০৮-২০১৩ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুল রহমান মসজিদে সিরাতুন নবী (সা.) উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। অত:পর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী, সেক্রেটারী তবলীগ ও মওলানা মোহাম্মদ খুরশিদ আলম। সবশেষে সভাপতি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাম ও মর্যাদার ওপর আলোকপাত করেন এবং জামা'তের সদস্যদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ পূর্বক নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন, এ শাহীন আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তারুয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১০/০৯/২০১৩ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরীব মজলিস আনসারুল্লাহ্ তারুয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব খলিল আহমদ, যয়ীম, তারুয়া। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও উর্দু নযম পেশ করেন জনাব জহির আহমদ ও জনাব ছাব্বির আহমদ। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব ফজলুল হক ভূইয়া, জনাব জহির আহমদ মিয়াজী ও মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। অনুষ্ঠানে ১৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিনয় আমীন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার ১১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০৮/২০১৩ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে ১১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় সভানেত্রী ছিলেন মুক্তা বশির, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেবাড়িয়া, নাটোর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের মুফাত্তিস।

অনুষ্ঠানে শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন শবনম মুস্তারি, আহাদনামা পাঠ করান প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্। এরপর উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়া পরিচলনা করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুস সালাম। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে

বক্তব্য রাখেন রশিদা করীম, লাকী আহমদ এবং রাজশাহী অঞ্চলের মোফাত্তিস। ইজতেমার সমাপ্তি ভাষণ ও পুরস্কার প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্।

দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেবাড়িয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৮/০৮/২০১৩ তারিখ রোজ বুধবার ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমার সভানেত্রী ছিলেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাদেকা হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেহেনা খায়ের। আরো উপস্থিত ছিলেন সালমা আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া। ইজতেমায়ী দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন সভানেত্রী। অত:পর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। ইজতেমায় স্বাগত ভাষণ ও বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন উম্মে কুলসুম চায়না, জেনারেল সেক্রেটারী। উর্দু ও বাংলা নযম পেশ করেন খাওলাদ্বীন উপমা এবং সুলতানা নাসির সোনিয়া। বক্তৃতা পর্বে তবলীগের গুরুত্ব ও ওসীয়্যতের কল্যাণ এর ওপর বক্তব্য রাখেন নুসরাত নাজির সুমি। নারী জাতির প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগ্রহ এই বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন দিলরুবা বেগম মায়া। এরপর ক্বাসিদা পরিবেশন করা হয় দলগতভাবে। অত:পর কেন্দ্র থেকে আগত মেহমানগণ নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাওলাদ্বীন উপমা। বাংলা ও উর্দু নযম পেশ করেন যথাক্রমে সুরাইয়া নাসের তুলি ও তাহমিনা ফয়েজ মিতু। অত:পর বক্তৃতা পর্বে নারী জাতির প্রতি হুযূর (আই.) এর নির্দেশাবলী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জুয়েল বেগম দিবা, বান্দার প্রতি খোদার অনুগ্রহ এর ওপর বক্তব্য রাখেন সুফিয়া বেগম। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ফাতেমা নুসরাত- সুস্থ দেহ সুস্থ মন এর ওপর বক্তব্য পেশ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণের পর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মাসুমা শামীম, সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি। সমাপনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি সাদেকা হক তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে ২০তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় ১৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার কর্মতৎপরতা

২৫তম বার্ষিক ইজতেমা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার ২৫তম বার্ষিক ইজতেমা গত ২৮ ও ২৯ জুন অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোরায়েশা মাজেদ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনিয়া আশা। হাদীস পাঠ করেন কোরায়েশা মাজেদ। তারপর সভানেত্রী দোয়া ও আহাদ পরিচালনা করেন। তারপর নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। লাজনা ও নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে ইজতেমা সম্পর্কিত নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী। এরপর ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। এরপর প্রতিযোগিতার পর্ব শুরু হয়। ২৮-০৩-২০১৩ তারিখে লাজনা বোনদের নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। নামায ও খাওয়ার পর শুরার প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল। এরপর সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ও অনুষ্ঠানে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন নাজমা ইসলাম, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি। এরপর পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ইজতেমায় লাজনা নাসেরাত ও মেহমান সহ মোট ৭১ জন উপস্থিত ছিলেন।

তবলিগী অনুষ্ঠান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ০৮-০৬-২০১৩ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার বাসায় এক তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাজমা মাসুদ। হাদীস পাঠ করেন সেলিনা এলাহী। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন রোখসানা মাসুদ। বয়আতের শর্ত পড়েন মুক্তা রবি। এতে বক্তব্য রাখেন শাহীনা মোস্তাক ও সভানেত্রী। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩ জন মেহমানসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রোকশানা মঞ্জুর

মিরপুরে বুকষ্টল চালু

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর এর ইশায়াত (পাবলিকেশন্স) বিভাগ এর পক্ষ থেকে বুক ষ্টল চালু করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। এখন থেকে নিয়মিত প্রতি শুক্রবার বুক ষ্টল চালু থাকবে। এতে জামা'তের বিভিন্ন বই-পুস্তক বিক্রয় ও তবলীগি লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৩ আগষ্ট শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে একটি বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

কুমিল্লায় নও মোবাঈন তালিম তরবিয়ত ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লার উদ্যোগে ন্যাশনাল সেক্রেটারী নওমোবাঈন জনাব মুসলেহ উদ্দিন ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব আব্দুল আজিজ উপস্থিতিতে গত ৩০, ৩১ সেপ্টেম্বর ও ১লা আগষ্ট তিনদিন ব্যাপী নও মোবাঈন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নওমোবাঈন সেক্রেটারী ও তরবিয়ত সেক্রেটারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত প্রদান করেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ক্লাস নেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। ক্লাসের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় এবং শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে ইউ,কে জলসা দেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর কর্মতৎপরতা

তালিম ক্লাস

লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ আগষ্ট তেজগাঁও জামে মসজিদে লাজনা, নাসেরাতদের নিয়ে তালিম ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসে সহি কুরআন পাঠ, দোয়া, অর্থসহ নামাযের বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর জেনারেল সেক্রেটারী শারমিন ইমতিয়াজ। ক্লাস শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

১২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৭ সেপ্টেম্বর লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে তেজগাঁও জামে মসজিদে সদর, লাজনা ইমাইল্লাহর সভাপতিত্বে ১২তম স্থানীয় ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ইজতেমার শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামা'তের ভাইসপ্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম। আহাদনামা পরিচালনা করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট, ভিকারুন্নেছা লুনা।

উর্দু নযম পাঠ করেন বদরুন্নেছা এমি। এরপর বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন শারমিন ইমতিয়াজ, জেনারেল সেক্রেটারী। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন' এর ওপর বক্তব্য রাখেন আরিফা রহমান। এরপর 'ইসলামে আতিথিয়তার গুরুত্ব' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন নেহেলা সিদ্দিকা অর্পিতা। এরপর দৈহিক সুস্থতার উপর বক্তৃতা রাখেন কেন্দ্রিয় প্রতিনিধি সেহেলী সুরাইয়া। এরপর ইজতেমার সভাপতি রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ, হুযূর (আই.)-এর নসীহতের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই ইজতেমার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২.৩০মি। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মনিরা সিদ্দিকা। এরপর দলগত কাসিদা পাঠ করা হয়। শেষের দিকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। প্রতিযোগিতা শেষে নযম পাঠ করেন তাসলীম এহসান ঐশী। এরপর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট। দোয়ার মাধ্যমে ১২তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

আন্তর্জাতিক জামাতী-সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কানাডার ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনষ্ঠিত :

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কানাডা গত ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট, ২০১৩ তাদের ২০তম বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন করেন। ইজতেমাস্থল হিসাবে নির্বাচন করা হয় অন্টারিও প্রদেশের ম্যাপল জামা'তের বাইতুল ইসলাম মসজিদ থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত হাদীকা আহমদ নামক স্থানটিকে, যা Bradford-এর পশ্চিম Gwillubury -তে অবস্থিত।

ইজতেমা উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা, পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন খেলাধূলা ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।

১৯৩৮ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইজতেমার মাধ্যমে কানাডা জামা'ত খোদ্দামুল আহমাদীয়ার ৭৫তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে।

এই ইজতেমা উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইতিহাস সবার কাছে তুলে ধরা হয়।

ইজতেমার সময় সবাইকে খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ইজতেমায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন। সাধারণ খেলাধুলার পাশাপাশি ঘোড় দৌড়, ধনুক-বিদ্যা, পাহাড়ে অবতরণ- এর মত বিশেষ শরীরচর্চারও আয়োজন করা হয়।

কানাডার আমীর সাহেব এবং সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া নতুন প্রজন্মের সেসব আতফালকে স্বাগত জানান, যারা অচিরেই খোদ্দাম হতে যাচ্ছে। খোদ্দামের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর সভারও আয়োজন করা হয় আর এতে সভাপতিত্ব করেন আমীর সাহেব।

তিন দিনব্যাপী এই ইজতেমায় যারা অংশ গ্রহণ করেছেন, তারা সবাই বুদ্ধি-বৃত্তিক চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যেসব সদস্য এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি, তাদেরকে সদর সাহেব টিভি'তে অনুষ্ঠানটি দেখার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এ অনুষ্ঠান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও যেন আগামীতে ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুইজারল্যান্ডের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে গত ৭ ও ৮ জুন, ২০১৩ তারিখে নূর মসজিদের নিকটবর্তী Sonterswil-এর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুইজারল্যান্ডের বার্ষিক-ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ জুন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক-কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন, আহাদ ও নযম পাঠের পর মওলানা সাদাকাত আহমদ তার উদ্বোধনী ভাষণে খোদ্দাম ভাইদেরকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর খোদ্দাম ও আতফালের বিভিন্ন ধর্মীয় ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মোট ৩০টি ধর্মীয় ও ২০টি খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তারা অংশ গ্রহণ করেন।

এছাড়া খোদ্দাম ও আনসারের মধ্যে একটি প্রীতি-ভলিবল-ম্যাচ ও কবিতা পাঠের আসরেরও আয়োজন করা হয়। এ বছর ইজতেমার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা'। এ সময় মওলানা নাবীল আহমদ 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'রসূল প্রেম' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে রোববারের কার্যক্রম আরম্ভ হয় আর দুপুরের আগেই সকল প্রকার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়ে যায়। অপরাহ্নে ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার-বিতরণী-অনুষ্ঠান হয়। এরপর সুইজারল্যান্ড জামা'তের আমীর, জনাব তারেক ওয়ালীদ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি খোদ্দাম ও আতফালকে খোদা তা'লার সঙ্গে দৃঢ় ও সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান। এবার মোট ১৮৪জন ইজতেমায় যোগদান করেন বলে জানা গেছে।

তেজগাঁও জামা'তে যুক্তরাজ্যের ৪৭ তম জলসা সালানা প্রদর্শিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর বিশেষ তদারকিতে তেজগাঁও মসজিদ এবং জামা'তের সদস্যদের বাসায় যুক্তরাজ্যের ৪৭তম সালানা জলসা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উপভোগ করেছেন। প্রায় ২০টি এমটিএ সংযোগের মাধ্যমে তেজগাঁও জামা'তের সদস্যরা জলসার বরকত থেকে কল্যাণ মন্ডিত হয়। জলসার পূর্বেই জলসার অনুষ্ঠান সূচী সম্পর্কে সকলকে অবগত করানোর ফলে জলসার বিশেষ বক্তৃতা ও হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা এবং দোয়ায় অংশ নেয়া সকলের জন্য সহজ হয়। মসজিদে আহমদীসহ মেহমানরাও জলসার কার্যক্রম উপভোগ করেন এবং তারা জলসার প্রশংসা করেন।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ

গাজীপুর জামা'তে জলসা সালানা ইউ,কে প্রদর্শিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গাজীপুরের ব্যবস্থাপনায় 'জলসা সালানা ইউ.কে ২০১৩' সুন্দর ভাবে এমটিএ-এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রকাশ থাকে যে, আগত মেহমানগণসহ স্থানীয় জামা'তের উপস্থিত সদস্যগণ ৩০ আগষ্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে 'জলসা সালানা ইউ কে ২০১৩' এর সকল অধিবেশন উপভোগ করেন।

মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

উল্লেখ্য যে, আরও বহু স্থানীয় জামা'তে ইউ.কে জলসা ২০১৩ প্রদর্শিত হয়েছে। রিপোর্ট এখনও আসছে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের ৫ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২/০৮/২০১৩ রোজ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে ৫ম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমার সভানেত্রী ছিলেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট নুরুন্নাহার বেগম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ইজতেমায় সমাপ্তি ভাষণ ও পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

নুরুন্নাহার বেগম

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবের্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদা তা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামে বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুণরায় সজীব হবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

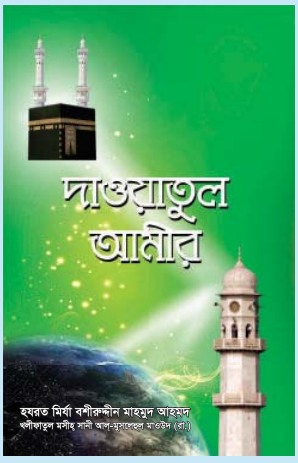

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 6th Issue
The Ahmadi Fortnightly
30th September, 2013 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com